সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

জামায়াতে ইসলামীর
ঊনত্রিশ বছর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

কিছু কথা

'জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর' মূলত জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) এর প্রদত্ত একটি ভাষণ। ১৯৭০ সালের ২৬ আগষ্ট তিনি এ ভাষণ প্রদান করেন। পাক-ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশের চরম দুঃসময়ে কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয় তার এক নিখুঁত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা। জামায়াতে ইসলামী তথা ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরাই রচনা করতে থাকেন, তাঁদের জন্যে প্রয়োজনীয় মালমসলা ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে গেছেন সেই মহান শিল্পী নিজেই, যিনি তাঁর বহুদিনের চিন্তা গবেষণা ও সাধনালব্ধ জামায়াত নিজ হাতে রচনা করে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য তাঁর এ ভাষণ থেকেই লাভ করা যেতে পারে যা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

শিল্পীর নিজের মুখে তাঁর রচিত শিল্পের আদ্যোপান্ত ইতিহাস শুনতে যেমন ভালোও লাগে, তেমনি তার প্রতি জন্মে শ্রদ্ধা ও দৃঢ় প্রত্যয়। এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস তার প্রতিষ্ঠাতার মুখে শুনতে ভালো লাগবে। এ ইতিহাস আন্দোলনের এক অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করবে হৃদয়ের গভীরে, এ আশা পোষণ করেই আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছি।

অবশ্যি এ কথা ঠিক যে, এটা জামায়াতে ইসলামীর বিস্তারিত ও বিশদ ইতিহাস নয় এবং উনত্রিশ বছরের ইতিহাস এতো অল্প কথায় বলাও যায় না। তবে যে উত্তপ্ত ও নৈরাশ্যজনক পরিবেশ পরিস্থিতিতে এ জামায়াতের জন্ম, তার যে দাবীই ছিল এ ধরনের জামায়াত গঠনের তা মাওলানার ভাষণে তথা এ গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট। জামায়াতে ইসলামী গঠনের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে এবং তার বিস্তারিত ইতিহাস হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত আছে। মাওলানার ভাষণ তথা এ গ্রন্থখানি পাঠকের মনে শুধু বিস্তারিত ইতিহাস জানার আগ্রহই সৃষ্টি করবেনা, আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার প্রেরণাও সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি।

আশা করি পাঠকবর্গ গ্রন্থখানি সেই আলোকেই পাঠ করবেন।

আব্বাস আলী খান

সূচিপত্র

ভূমিকা

গত ২৬শে আগষ্ট জামায়াতে ইসলামীর রুকন, মুত্তাফিক ও শুভানুধ্যায়ীদের এক সমাবেশে আমি নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেই। ইহা প্রায় ২৫/৩০ জন ব্যক্তি টেপ রেকর্ড করে নেন এবং তাদেরই একটি টেপ রেকর্ডার থেকে এটা গ্রহণ করা হয়েছে। লিখিত রূপ দেয়া ছাড়া এর মূল বক্তব্যে অন্য কোনো রদবদল আমি করিনি। যেসব বিষয়ে আমি কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেছি সেটা আমি পাদটিকায় লিখে দিয়েছি।

বিশেষ পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, কোনো কোনো পত্রিকা আমার এ বক্তব্য অত্যন্ত বিকৃতরূপে প্রকাশ করেছে। এমনকি আমি আদৌ বলিনি এমন সব কথাও রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমাদের সাংবাদিকতা এত নিম্নস্তরে নেমে যাওয়া মোটেই গৌরবের কথা নয়। এখন এ ভাষণ ইনশাআল্লাহ সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছে যাবে। ইচ্ছে করলে যে কেউ কোনো টেপরেকর্ডারে একে মিলিয়ে দেখতে পারবেন এবং এক শ্রেণীর সাংবাদিক কিরূপ মিথ্যা প্রচার করে থাকে তাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

আবুল আ'লা মওদূদী

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর

প্রিয় বন্ধুগণ এবং সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ! আজ থেকে ঠিক উনত্রিশ বছর আগে এ তারিখে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা সংঘটিত হয়। লাহোর নগরীর একটি মহল্লা ইসলামিয়া পার্কে মাওলানা জাফর ইকবাল সাহেবের বাড়ীর নিকটে একটি ছোট্ট বাড়ী। সে বাড়ীর একটি কক্ষে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র অবিভক্ত ভারত থেকে পঁচাত্তরজন লোক অংশগ্রহণ করেন এবং তারা 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল গঠন করেন।

মূলত এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এটা এমন কোনো ঘটনাও ছিল না যে, কোনো ব্যক্তির মনে হঠাৎ একটা দল গঠনের ইচ্ছে গজিয়ে উঠলো আর সে অমনি কিছু লোক সংগ্রহ করে একটা দল খাড়া করে ফেললো। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল আমার দীর্ঘ বাইশ বছরের অবিশ্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা গবেষণা ও অনুশীলনের ফল যা তখন একটা পরিকল্পনার রূপ পরিগ্রহ করে এবং সে পরিকল্পনা অনুসারেই জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়।

আজ প্রথমবারের মত আমি জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করছি যা আজ পর্যন্ত কোনো বক্তৃতায় বা রচনায় বর্ণনা করিনি। আমার নিকটতম সাথীদের নিকটও আমি শুধুমাত্র এর ছিটেফোটাই উল্লেখ করেছি, কিন্তু একটি সংঘবদ্ধ ইতিহাসের আকারে এটি পেশ করার কোনো সুযোগই এযাবত হয়ে উঠেনি।

পাছে এ ইতিহাস আমার সাথে সাথে কবরে চলে যায়, সে আশঙ্কায় আজ আমি তা বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। অন্যথায় আমার যে অভিজ্ঞতা ও চিন্তা গবেষণার ফলে জামায়াতে ইসলামীর মত দল গঠনের পরিকল্পনা জন্ম লাভ করেছিল, তা জনগণের অজানাই থেকে যেত।

খেলাফত আন্দোলন

আমি যখন কৈশোরে পদার্পণ করি তখন পাক ভারত উপমহাদেশে চলছিল এক বিরাট আন্দোলন। একদিকে মুসলমানগণ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে

পুণ্যভূমিসমূহ ও ইসলামী খেলাফতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জানমাল উৎসর্গ করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন খেলাফত ভালোমন্দ মিলিয়ে যে আকারে কায়েম ছিল, সে ভাবেই তা রক্ষা করতে হবে এবং পবিত্র স্থানসমূহকে কাফেরদের আধিপত্যমুক্ত করতে হবে, এ ছিল তাদের দুর্দম সংকল্প। এ ছিল একটি পবিত্র ধর্মীয় আবেগ যা সমগ্র মুসলিম জাতিকে উদ্বেলিত ও আন্দোলনমুখর করে তোলে, অপরদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সারা ভারতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সারা ভারত ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার অদম্য প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং হিন্দু ও মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করে।

মুসলমানদের মনে খেলাফত রক্ষার প্রেরণা প্রাধান্য লাভ করে আর এর নেতৃত্ব দিচ্ছিল খেলাফত আন্দোলন। হিন্দুদের মনে ছিল স্বাধীনতা অর্জনের আগ্রহ এবং তারা কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে তা অর্জনের জন্য ছিল সংগ্রামমুখর। উভয় জাতি গান্ধীজিকে সম্মিলিত ভাবে নেতা মেনে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে এবং মুসলিম জাতির কয়েকজন নেতা ব্যতীত তখন সমস্ত শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম নেতাই এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

আমি তখন ১৬/১৭ বছরের নবীন যুবক মাত্র। স্বভাবতই আমার মনে নিজ জাতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর অগাধ আস্থা ছিল এবং তা থাকার কথাও। প্রত্যেক মুসলমানের মত আমারও এজন্য মনে দুঃখ হতো যে মুসলমানদের একটিমাত্র স্বাধীন সাম্রাজ্য অবশিষ্ট ছিল অর্থাৎ তুর্কী সাম্রাজ্য, তাও তখন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। খেলাফত যে অবস্থায়ই থাকুকনা কেন তা তখনো দুনিয়ার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারতো। অথচ তাও লুপ্ত হতে যাচ্ছিল এবং মুসলমানদের সমস্ত পবিত্র স্থানের স্বাধীনতা বিপন্ন মনে হচ্ছিল। এ সম্পর্কে সমগ্র জাতির যেরূপ মনোভাব ছিল, একজন মুসলমান হিসাবে আমারও তদ্রুপ ছিল। তাই আমিও খেলাফত আন্দোলনে একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে যোগদান করি।

কিন্তু প্রথম থেকেই আমার অভ্যাস ছিল যে, যে বিষয়েরই সংস্পর্শে আমি গিয়েছি বা যে বিষয়ের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, আমি সে বিষয়ে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে জ্ঞান ও তথ্য অর্জনের চেষ্টা করেছি যাতে করে বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে পারি। এ অভ্যাসের অনুবর্তী হয়ে আমি খেলাফত সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করি এবং এ থেকে আমি জানতে পারি যে তুর্কী জাতির মধ্যে যে নেতৃত্ব সক্রিয় ছিল তা তুর্কী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। আর তুর্কী যুবকরা পাশ্চাত্য জাতি থেকে যে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ বহন করে এনেছিল তা দ্বারা এ নেতৃত্বের মেজাজ ও প্রকৃতি সংক্রেমিত হয়েছিল।

এ অধ্যয়ন থেকে আমি এ কথাও জানতে পেরেছিলাম যে, ইসলামের শত্রুরা তুর্কী জাতীয়তাবাদের জবাবে আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের এক দুর্বার আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল, যার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধে আরব ও তুর্কী মুসলমান সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার পরিবর্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিল। তুর্কী নেতৃবৃন্দ একদিকে ইসলামী খেলাফতের পরিচালনা অব্যাহত রাখতে চান, অপরদিকে তাকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে চালাতে চান। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কি থাকতে পারে? তুর্কী নেতৃবৃন্দ তাদের সাম্রাজ্যকে তুর্কী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে চালাতে গিয়েও চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। কেননা এ সাম্রাজ্যে আরব কুর্দ এবং অন্যান্য বহু অতুর্কী মুসলমানও বসবাস করতো যারা ইসলামী খেলাফতের অনুগত হতে পারতো কিন্তু তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে প্রস্তুত হতো না। অন্যদিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রবঞ্চনায় পড়ে যে আরব নেতৃবৃন্দ তুর্কী জাতীয়তাবাদের মোকাবেলায় আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলেছিল তারাও অমার্জনীয় বোকামীর পরিচয় দিয়েছিল। এ ইতিহাস যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমার মনে নানা প্রশ্নের উদ্ভব হলো। ভাবলাম, যে খিলাফতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতের মুসলমানরা নিজেদের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে বসেছে তার আদৌ কোনো ভিত্তিই নেই। আমাদের গোটা জাতি এমন একটি বৈদেশিক সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। ধর্মনিরপেক্ষতবাদী তুর্কীরা যদি নিজ হাতেই ইসলামী খেলাফতের অবসান ঘটায় তাহলে আমাদের আন্দোলনের কি দশা হবে? কিন্তু এসব প্রশ্ন সত্ত্বেও যেহেতু আমি একজন তরুণ মাত্র ছিলাম তাই আমার মগজে এরূপ চিন্তা করার মত দুঃসাহস ছিল না যে, আমাদের জাতির বড় বড় নেতাগণ যা বুঝেন না, আমি তা বুঝি। তাই ওসব প্রশ্ন মনের মধ্যে চেপে রেখেই আমি খিলাফত আন্দোলনের কাজ করতে থাকি।

হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও স্বরাজ আন্দোলন

এমনিভাবে যখন হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হলো, কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানরা কাজ শুরু করলো এবং চারদিক থেকে 'স্বরাজ' এর আওয়াজ উঠতে থাকলো, তখন আমি এ ব্যাপারেও অনেক চিন্তা গবেষণা ও পড়াশুনা করলাম। কংগ্রেসের ইতিহাস পড়লাম, তার উদ্দেশ্য লক্ষ্যের সাথে পরিচিত হলাম, ভারতে যে পন্থায় গণতন্ত্রের বিকাশ হয়ে আসছিল এবং কংগ্রেস যে পন্থায় তাকে পূর্ণতার রূপ দিতে চাইছিল, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, ইংরেজরা ভারতে এসে নিজ দেশের অনুকরণে এদেশের অধিবাসীদেরকেও এক জাতি মনে করে নিয়েছে। আর সে অনুসারে তারা নিজ দেশের রীতি অনুযায়ী এ

দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চাচ্ছে। হিন্দুদের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে বেশী লাভজনক ব্যাপার। কেননা তারা ছিল সংখ্যাগুরু। তারা মনে করত যে ভারতের সমস্ত অধিবাসীকে একজাতি ধরে নিয়ে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে তারা একতরফা ফায়দা লুটতে পারবে এবং এতে শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা শুধু হিন্দুদের অধীনস্থই হবে না বরং কার্যত এক প্রকারের গোলামে পরিণত হবে। কংগ্রেসের ইতিহাস অধ্যয়নের পর যখন আমি এ কথা উপলব্ধি করলাম তখন আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, আমাদের জাতির নেতৃবৃন্দ কিভাবে কংগ্রেসের সাথে ঐক্য স্থাপন করছেন? আমার পক্ষে এটাও বিস্ময়কর ছিল যে, শুধু তখনই নয় বরং তার পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত সমস্ত শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতাগণ উপমহাদেশে মাত্র একটি জাতি বাস করে ধরে নিয়ে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে সম্মত ছিলেন এবং তার মধ্যে মুসলমানদের জন্যে শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। মুসলিম অমুসলিম কিভাবে এক জাতি হতে পারে এবং তাদেরকে এক জাতি ধরে নিয়ে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে মুসলমানদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা হতে পারে, তা একেবারেই আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল। শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ সম্পর্কে আমি যতই চিন্তা করতাম ততই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতাম যে, যদ্দিন ইংরেজদের সরকার বহাল থাকে এবং তারা এ রক্ষাকবচের রক্ষণাবেক্ষণ করে কেবল তদ্দিনই তা টিকতে পারে কিন্তু যদি কোনোদিন ভারত ইংরেজদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পায় তাহলে আর রক্ষাকবচের অস্তিত্ব থাকবে না। তখন এমন করুণ দৃশ্যও দেখতে হবে যে, স্বাধীন ভারতে মুসলমানরা শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের দলিল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর হিন্দুরা যা খুশী তাই করতে থাকবে। তখন হিন্দু সংখ্যাগুরুর যুলুম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো শক্তিই মুসলমানদের থাকবে না।

আমার মনে এ প্রশ্নটি বরাবর চাপা পড়ে থাকে। কেননা আমি আগেই বলেছি, একজন যুবকের পক্ষে নিজের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল যে, আমিই জাতির সমস্যাবলী জাতির নেতৃবৃন্দের চেয়ে ভালো বুঝি। তাই উক্ত প্রশ্ন আমার মনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমি তা নিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের পরিচালিত আজাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে থাকি।

১৯২৪ সালে আমার মনের সমস্ত চাপা আশঙ্কা হঠাৎ সত্য ঘটনা হয়ে দেখা দিল। আর সেই সাথে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আমার আস্থাও বিচলিত হলো। তুরস্কের যে ওসমানী খেলাফতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সারা ভারতের মুসলমানরা সর্বস্ব পণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল খোদ তুর্কী শাসকগণ ১৯২৪ সালে নাটকীয়ভাবে সে খিলাফতের ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের কথা ঘোষণা করে

বসলেন। নিজ দেশের সমস্ত সমস্যাবলীকে অগ্রাহ্য করে যে খিলাফতের জন্যে আমাদের জাতি গোটা বিশ্বের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়েছিল, সে খিলাফতের নিশানবাহীরা নিজেরাই ঘাড়ের ওপর থেকে খিলাফতের গুরুভার দূরে নিক্ষেপ করলো আর ভারতের মুসলমানরা তাদের দিকে মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। এ ঘটনার পরিণতি এ দাঁড়ালো যে আকস্মিকভাবে মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড নিদারুণ হতাশায় ভেংগে পড়লো।

অপরদিকে ১৯২৪ সালেরই শেষেরদিকে সে হিন্দু মুসলিম ঐক্যও খতম হয়ে গেল যার ভিত্তিতে এ যুগান্তকারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ভারতের স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার হিড়িক পড়ে গেল এবং এসব দাঙ্গায় গান্ধী থেকে শুরু করে সকল স্তরের হিন্দু নেতাদের নীতি ছিল যে, মুসলমান মযলুম হলেও তার নিন্দা করা আর হিন্দু যালেম হলেও তার সমর্থন করাই চাই। ১৯২৪ সালের শেষের দিকে এ নীতি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছিল। এ থেকে বুজা গিয়েছিল যে, হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যাপার এবং তা কখনো বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়।

শুদ্ধি আন্দোলন

এরপর ১৯২৫ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন (মুসলমানদেরকে হিন্দু বানানোর আন্দোলন) শুরু করলেন। এ শ্রদ্ধানন্দকেই হিন্দু মুসলিম ঐক্যের যুগে মুসলমানরা নিজেরাই দিল্লী জামে মসজিদের মুকাব্বারে দাঁড় করিয়ে তাকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়েছিলেন।

কেউ কেউ এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে শ্রদ্ধানন্দকে মসজিদের মিম্বরের ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল। অথচ এ ধারণা ঠিক নয়। আসলে তাঁকে মুকাব্বরের ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল। (দিল্লী জামে মসজিদের যে উঁচু স্থানটায় দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন তকবীর দিয়ে থাকে তাকেই বলা হয় মুকাব্বার)। আমি স্বয়ং তখন জামে মসজিদের সে জনসমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। আমি শ্রদ্ধানন্দকে মসজিদের মুকাব্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম যে মুসলমানদের কোন পাগলামীতে পেয়ে বসলো যে তারা একজন হিন্দুকে ডেকে এনে জামে মসজিদের মুকাব্বারে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দেয়াচ্ছে? এর মাত্র দু'তিন বছর যেতে না যেতেই এ লোকটি মুসলমানদের এ উদারতার এভাবে প্রতিশোধ নিল যে, প্রকাশ্যে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করে দিল।

যখন শুদ্ধি আন্দোলন শুরু হয় তখন আবার আমি সেটি নিয়ে চিন্তাগবেষণা ও পড়াশুনা শুরু করি। আমি চিন্তা করতাম যে, এক সময়ে মুসলমানরাই সারা

দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার করতো আর আজ কিনা অবস্থা এত দূরে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এ উপমহাদেশে এক ব্যক্তি মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে হিন্দু বানানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। আমি সে যুগে এ বিষয় নিয়ে যতদূর পড়াশুনা করি তা থেকে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মুসলমান প্রকৃতপক্ষে একটি মিশনারী জাতির নাম, শুধু একটি জাতির নাম নয়। মুসলমান এমন একটি জাতির নাম যার দুনিয়ায় নিজস্ব মিশন রয়েছে। ইসলাম কখনো পেশাদার প্রচারকদের দ্বারা প্রচারিত হয়নি এবং প্রতিটি মুসলমান মুসলমান হিসেবেই একজন প্রচারক। তার শুধু নিজের মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের আচার আচরণ, আলাপ ব্যবহার, চাল চলন, স্বভাব চরিত্র মোটকথা প্রতিটি বিষয় দ্বারাই তাকে ইসলাম প্রচার করতে হয়। যদ্দিন মুসলমানদের মধ্যে একটি মিশনারী জাতির এসব গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল তদ্দিন তারা তরবারী ছাড়াই নিছক প্রচারের জোরে দেশের পর দেশ জয় করেছে। সমগ্র ইন্দোনেশিয়া এ প্রচারের কারণেই মুসলমান হয়েছে। কোনো মুসলমান সেখানে তরবারী নিয়ে যায়নি। মালয়েশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা এবং আরো কয়েকটি দেশ এমন রয়েছে যেখানে মুসলমানরা নিজ নিজ স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহার দ্বারাই মানুষের মন জয় করেছে এবং অসংখ্য জাতিকে মুসলমান বানিয়েছে। এ পাক ভারত উপমহাদেশের কথাই ধরা যাক। এখানে যে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে তাদের সবাইতো আর বিদেশ থেকে আসেনি। তখনকার মুসলিম সরকারগুলো এবং সম্রাটগণ কখনো শক্তি প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচার করেননি। যারা মুসলমান হয়েছেন সকলেই কেবল দাওয়াত ও প্রচারের ফলেই মুসলমান হয়েছেন। আমি চিন্তা করে দিশা পেতাম না কি কারণে ইসলামের প্রচার বন্ধ হয়ে গেল? অধিকন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম প্রচারের সাহস কোথা থেকে পেলো? এসব প্রশ্নের সমাধান লাভের জন্য আমি আবার চিন্তা গবেষণা ও পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করি। অবশেষে আমি উপলব্ধি করি যে, মুসলমান দীর্ঘ দিন ধরে নিজেদের প্রচারক বা মিশনারী জাতি হওয়ার দিকটা বিস্মৃত হয়ে গেছে এবং শুধু একটা জাতিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। এখন তাদের কার্যকলাপ দ্বারা কার্যত একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কলেমা পড়লে বা না পড়লে মানুষের জীবনে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না। একজন অমুসলিম যত বড় মিথ্যাবাদী হতে পারে অনেক মুসলমানও তত বড় মিথ্যাবাদী হতে পারে। একজন অমুসলিম যতখানি দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে অনেক মুসলমানও ততখানি দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে, মুসলমানও ব্যভিচার করে অমুসলমানরাও করে। মুসলমানরাও ঘুষখোর হতে পারে অমুসলমানরাও হতে পারে। মুসলমানরা যখন নিজেদের এ পরিচয় অন্যান্য জাতির সামনে তুলে ধরে তখন এখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কোনো উপায়ই থাকতে পারে না। এরপর হিন্দুদের মনে

মুসলমানদের মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলন চালানোর সাহস জন্মানো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তারা বলতে পারে যে তোমাদের ও আমাদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিল, এখন ধর্ম পরিবর্তন করেও যখন তোমাদের জীবনে ও চরিত্রে বিশেষ কোনো পার্থক্য আসেনি, তখন পৈতৃক ধর্মের দিকে ফিরে আস।

এ সময়ে আমি 'আল জমিয়ত' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ লিখি। এ নিবন্ধটি তখন 'ইসলামে শক্তির উৎস' নামে একটি বই এর আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আমি আমার চিন্তা গবেষণার ফল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করে দিয়েছিলাম। সে সময় থেকে আমার মনমগজে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, পুনরায় একটি মিশনারী তথা আন্দোলনমুখর জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। অবিভক্ত ভারতে মুসলমানরা যে জটিল সমস্যায় জর্জরিত ছিল, আমার দৃষ্টিতে তা থেকেও মুক্তি লাভের এ একই পথ ছিল। নচেৎ শুধুমাত্র একটি জাতি হিসেবে বাস করলে এখানে তাদের কল্যাণ নেই।

শ্রদ্ধানন্দ হত্যা

এর পরে ১৯২৬ সালে জনৈক মুসলমান স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হঠাৎ হত্যা করে বসলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হয়ে গেল। গান্ধীজী পর্যন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন যে, ইসলাম হচ্ছে তরবারী ও হিংসার ধর্ম।

এ সময়ে আমার মনে এ সংকল্প জন্মে যে, আমি ইসলামের জেহাদ নীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অনুশীলন করে তা বুঝার চেষ্টা করবো এবং এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করবো।[১] আমার এই অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফল হচ্ছে আমার গ্রন্থ 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম'। এটি আজও পুস্তকাকারে বর্তমান। এ অধ্যয়ন ও অনুশীলনকালে আমি বুঝতে পারি যে ইসলাম মূলত এ জন্য দুনিয়ায় আসেনি যে, কুফরী ব্যবস্থার অধীনে দেশ শাসিত হবে এবং মুসলমানরা এ বাতিল শাসন ব্যবস্থার পদানত হয়ে থাকবে। ইসলাম এসেছে এ জন্যে যে, পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের চাবিকাঠি মুসলমানদের হাতেই নিবদ্ধ থাকবে আর অমুসলিমরা তার অধীন হয়ে থাকবে। এই তত্ত্বানুসন্ধানকালে আমি এ সত্যও উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, মুসলিম জাতির ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রও একটি মিশনারী রাষ্ট্র হয়ে

---

(১) মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের এক বক্তৃতা শুনে আমি এরূপ সংকল্প গ্রহণ করি। তিনি অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেছিলেন যে, আজ ইসলামের জেহাদ নীতির বরাত দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তাই এ জেহাদ নীতির পূর্ণ বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেউ যদি এ প্রয়োজন পূরণ করতে এগিয়ে আসতো তবে জাতির বিরাট উপকার হতো।

থাকে এবং তা ন্যায় নীতি ও সুবিচার, সততা, দরিদ্রের সেবা এবং অন্যান্য সদাচরণের দ্বারা সারা দুনিয়ার সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও ন্যায় নিষ্ঠতার সাক্ষ্য দেয়। তার আইন আদালত, পুলিশ, সেনাবাহিনী, কূটনৈতিক বিভাগ মোটকথা তার প্রতিটি কাজে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি জাতি ও রাষ্ট্রকে ইসলাম কি রঙে রঞ্জিত করে আর কুফরই বা তার কি রূপ দেয় তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এ দিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্র মূলত একটি প্রচার ও দাওয়াত সর্বস্ব রাষ্ট্র। দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করাই তার কাজ। আর জেহাদেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কুফরের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা। এ সত্য সে সময়ই আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল আর তার পরেও অবিরাম এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করতে থাকে।

মুসলমানদের পাশ্চাত্য মুখীনতা

১৯২৪ সালের পর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে সাংঘাতিক বিভেদ ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৪/১৫ বছর পর্যন্ত সমগ্র জাতি মারাত্মক মানসিক জড়তা ও বিভ্রান্তিতে জর্জরিত থাকে। এ সময়ে ক্রমাগত এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে থাকে যা দেখে আমার মনে হতে লাগলো যে, মুসলমানরা সোজা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি মাত্র তিন চারটি উদাহরণ পেশ করবো।

এ সময়ে তুরস্কে এবং তুরস্কের দেখাদেখি অন্যান্য মুসলিম দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের এক তীব্র প্রবণতা দেখা দেয়। মুসলমানদের জাতীয় পোষাক পরিবর্তন করা হয়, তুরস্ক থেকে আরবী বর্ণমালাকে নির্বাসিত করা হয় এবং ইসলামী শরীয়তকে দেশের আইনের মর্যাদা থেকে অপসারণ করা হয় এবং পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে আইন কানুন আমদানী করে কার্যকর করা হয়। এমনকি মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে (Personal law) পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করা হয়, যা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদও কোনো মুসলিম দেশে করতে সাহসী হয়নি। ভারতের মুসলমানদের ওপরও এসব বিষয়ের প্রভাব পড়ে। তারাও ভাবতে শুরু করে যে তাদের পাশ্চাত্য পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করা উচিত। এমনকি বহু লোক আমাদের বর্ণমালা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ঐ সময় আমি পোষাক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি। এ প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম যে, পোষাক কোনো মামুলি জিনিষ নয়। বাহ্যত এক পোষাক বাদ দিয়ে অন্য পোষাক পরিধান করা বেশী দোষণীয় মনে না হতে পারে কিন্তু মূলত এর পেছনে খুব গভীর কৃষ্টিগত, ঐতিহ্যগত ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ ক্রিয়াশীল থাকে এবং পোষাক পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। এ প্রবন্ধ

সর্ব প্রথম ১৯২৯ সালে 'মায়ারেফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে তা আমার গ্রন্থ 'তাফহিমাতের' অন্তর্ভুক্ত।

এ সময় প্রকাশ্যে মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার প্রচার শুরু হয়ে যায়। মুসলমানদের ঈমান ও প্রত্যয়কে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ে এমন সব পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে যা সাহিত্যের নামে মুসলমানদের মধ্যে প্রকাশ্যে চরিত্রহীনতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা ও প্রেম প্রণয়ের বীজ ছড়ানো শুরু করে। এর কিছু নমুনা আমি আমার গ্রন্থ 'পর্দায়' উল্লেখ করেছি। এসব পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যে ধরনের ন্যাক্কারজনক প্রচারণা চলতে থাকে এবং যে ধরনের সাহিত্য জনগণের মধ্যে পৌছতে থাকে তা দেখে আমি অনুভব করতাম যে, জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। কেননা যে জাতি সংখ্যাগুরু কাফেরের মধ্যে বসবাস করে, তার ঈমান ও চরিত্র যদি এভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে সে কি করে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে? সে সময় মুসলমানদের মধ্যে কম্যুনিজমের প্রচারও শুরু হয়। কম্যুনিষ্টরা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার ঘাঁটি বানিয়ে দেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে কম্যুনিজম প্রচার করতে শুরু করে। [১]

দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল

ঐ সময় আমি আরো অনুভব করি যে, মুসলমানদের মধ্যে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার দরুন লোকেরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবেই এবং তাদের গোটা মনমানস পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে তৈরী হচ্ছে। আর প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত লোকেরা ধর্মীয় বিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল হলেও দুনিয়ার বিষয়াবলী সম্পর্কে অনবহিত থেকে যাচ্ছে। এ দুটো গোষ্ঠি যে মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে দুটো সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী চরিত্র ও মন মেজাজ সৃষ্টি করছে, তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও মানসিক দিক দিয়ে ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত

১। কেউ কেউ আমার এ উক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। অথচ সে সময় যেসব ইসলামী মনোভাবাপন্ন তরুণ আলিগড়ে শিক্ষারত ছিলেন তারা এখনও জীবিত আছেন। কম্যুনিষ্টরা কিভাবে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের প্রচার ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল সে সম্পর্কে তারা সাক্ষ্য দিতে পারেন। ১৯৩৬ সালে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট তরুণ সমাজে নাস্তিকতার প্রসারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং এর প্রতিকারের জন্য প্রস্তাবাবলী আহ্বান করেন। এর জবাবে আমি ১৯৩৬ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে দুটি প্রবন্ধ লিখি যা এখন আমার 'তানকিহাত' (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর একটি প্রবন্ধে আমি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রের একটি চিঠিও উদ্ধৃত করেছি। এ চিঠি দ্বারাই অনুমান করা যায় যে তখন সেখানে কি ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিল।

হচ্ছে। অপরদিকে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতরা ধর্মপরায়ণতার প্রতিপালন করে যাওয়া সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্যতা অর্জন করছেন না। আমি স্পষ্ট দেখতে পারছিলাম যে, এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে এমনকি উভয়ে উভয়ের ভাষা পর্যন্ত বুঝতে অক্ষম। এরূপ পরিস্থিতি দেখে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছিল যে, দূরত্ব খতম না হওয়া পর্যন্ত সংকট থেকে মুসলমানদের মুক্তির সম্ভাবনা নেই।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

এবার সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত আজাদীর কোনো আন্দোলন মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না এরূপ একটি সাধারণ ধারণা সারা ভারতে প্রচলিত ছিল। মুসলমানরাও এ ভরসায় ছিল যে, কংগ্রেস তাদেরকে সাথে না নিয়ে কোনো আন্দোলন চালাতে পারবে না। কিন্তু ১৯২৯ সাল পর্যন্ত গান্ধী বুঝতে পারলো যে, মুসলমানরা একেবারেই শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বলতে কিছুই নেই এবং কোনো শৃঙ্খলাও নেই। তাই এখন আমি শুধু হিন্দুদের সাথে নিয়ে বৃটিশ সরকারের সাথে সংগ্রাম করে আজাদী হাসিল করতে পারি। ১৯২১ সালে প্রথমবারের মত তিনি মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন, "আমি আজাদীর জন্য সংগ্রাম করবো, তোমরা এলে তোমাদের সাথে নিয়ে করবো, না এলে তোমাদের ছাড়াই করবো, আর যদি বিরোধিতা কর তবে বিরোধিতা সত্ত্বেও করবো।" তার ভাষা ছিল, "With you or without you or inspite of you গান্ধী যখন এ কথা বললেন তখনই আমি উপলব্ধি করলাম যে, এখন আর এদেশে মুসলমানদের কল্যাণ নেই। কেননা তিনি বাস্তবিকই শুধুমাত্র হিন্দুদের সাথে নিয়ে সংগ্রাম করে আজাদী হাসিল করতে সক্ষম ছিলেন এবং মুসলমানরা এমন সাংঘাতিক ভাবে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল যে তারা তার গতিরোধ করতে পারতো না।

তিনি মুসলমানদেরকে এমন সংকটে নিক্ষেপ করলেন যে তারা তিনটি কাজের মধ্যে একটি করতে বাধ্য হলো। হয় তারা শর্তহীন ভাবে হিন্দু নেতৃত্ব মেনে নিয়ে হিন্দুরাজ কায়েম করতে প্রস্তুত হবে অথবা নিরব দর্শক হয়ে তার ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার দৃশ্য দেখবে অন্যথায় বিরোধিতা করে বৃটিশ শাসনের তল্পিবহনের অপবাদ মাথায় পেতে নেবে।

দুর্ভাগ্যবশত সে সময় মুসলমানদের তিনটি গোষ্ঠি এ তিনটি পথই গ্রহণ করলো এবং সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো এক নেতৃত্বের অধীনে এক পথ অবলম্বন করতে পারলোনা। আমি সে ভয়াবহ পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখছিলাম এবং তার

পরিণতি কি হবে তাও বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু তখন এর মোকাবেলায় কিছু করতে পারি এমন অবস্থা আমার ছিল না। নিজের অসহায়তার ওপর বিলাপ করা ছাড়া আমার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।

তরজমানুল কোরআনের প্রকাশ

এ সময় আমি দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্যে) স্থানান্তরিত হই। সেখানে মুসলমানদের একটি বিরাট রাজ্য কায়েম ছিল। এ রাজ্য আয়তন, লোকসংখ্যা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক দিয়ে দুনিয়ার কোনো কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের চাইতেও বৃহৎ ছিল। এর শাসক ছিল মুসলমান। মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ এখানে অবস্থান করতেন। এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। এর উপায় উপকরণ শুধু হায়দরাবাদের লোকদেরই নয় বরং এর বাইরেও ভারতীয় মুসলমানদের শক্তির উৎস ছিল। হায়দরাবাদ রাজ্য বিশ্ববিখ্যাত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করে উর্দু ভাষাকে সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে মুসলমানরা গৌরব বোধ করত যে, ভারতে এমন একটি ভূখণ্ড রয়েছে যেখানে মুসলমানরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করছে। কিন্তু বাহ্যত এ চমকপ্রদ যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, নিজামের বিশাল সাম্রাজ্য বালুর সৌধ ছাড়া কিছু নয়। হায়দরাবাদ রাজ্যে মুসলমানদের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। বাদবাকী ৮৫ ভাগই ছিল হিন্দু। শুধুমাত্র সরকারী চাকরি ও পদসমূহই ছিল মুসলমানদের একমাত্র সহায়। ব্যবসাবাণিজ্য শিল্প কারখানা সবই হিন্দুদের কুক্ষিগত ছিল। মুসলিম জনসংখ্যা শহরে কেন্দ্রীভূত ছিল। গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। আমি বুঝতে পারলাম যে, যে আযাদী আন্দোলন সারা ভারতে চলছে তার স্রোত যখন হায়দরাবাদে এসে পৌঁছাবে তখন নিজামের সাম্রাজ্যের এ বিশাল সৌধ মাত্র এক ধাক্কায় ভূমিস্যাৎ হবে। আমি সেখানকার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যাক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করলাম যে, আপনারা এখানে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইসলাম প্রচারের একটা ব্যবস্থা করুন। কিন্তু আমার মনে হলো যেন নিজামের সরকার একটা নেশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং তা খেয়ে মুসলমানরা অলসতায় মত্ত হয়ে আছে। তাদের যত চিন্তা কেবল নিজামের সরকারকে কোনমতে খাপটে ধরে বাঁচানো যায় কিনা তাই নিয়ে। কিন্তু কিভাবে তার ভিত্তি মজবুত হবে সে চিন্তা কারো মগজেই ছিলনা। একমাত্র ইসলাম প্রচার দ্বারা তার ভিত্তি মজবুত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সেদিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করলনা। এ পরিস্থিতিতেই আমি হায়দরাবাদ থেকে ১৯৩২ সালে মাসিক তরজমানুল কোরআন প্রকাশ করা শুরু করি।

পাশ্চাত্য মানসিকতা অবসানের প্রচেষ্টা

সে সময়ে আমি যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম তা হচ্ছে, সর্বপ্রথম মুসলমানদের মেধাবী ও প্রতিভাবান শ্রেণীর মন মগজ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রভাব ঘুচাতে হবে। ইসলামের যে নিজস্ব জীবন পদ্ধতি কৃষ্টি, সভ্যতা, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, চিন্তাপদ্ধতি ও শিক্ষানীতি রয়েছে এবং তা যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর চাইতে সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা তাদের মনমগজে বদ্ধমূল করতে হবে। কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে কারুর কাছ থেকে কোনো ভিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন থাকতে পারে এমন ধারণা তাদের মস্তিষ্ক থেকে দূর করতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নিজস্ব একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা রয়েছে যা দুনিয়ার সকল মত পথ ও জীবন ব্যবস্থার চাইতে শ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্যের যে জীবন ব্যবস্থার রূপ দেখে তাদের চোখ ঝলসে গেছে, তার প্রতিটি দিক কত ত্রুটিপূর্ণ এবং কুৎসিত, তা ব্যাপক সমালোচনা দ্বারা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এ কাজ সম্পাদন করতে করতে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। ১৯৩৭ সালে আমাকে একবার হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী সফর করতে হলো। এ সফরের সময়ে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, ভারতের ৬টি প্রদেশে কংগ্রেসের সরকার কায়েম হবার পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে সুস্পষ্ট পরাজয়ের মনোভাব ফুটে উঠেছে। দিল্লী থেকে যখন আমি হায়দরাবাদ ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন ট্রেনের যে বগীতে আমি যাচ্ছিলাম ঘটনাক্রমে বিখ্যাত হিন্দু নেতা "ডক্টর খারে" ও সে বগীতেই সফর করছিলেন। ঐ বগীতে বহু মুসলমানও ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, একটি পরাধীন জাতির লোকেরা শাসক জাতির লোকদের সাথে যেভাবে কথোপকথন করে ঠিক সেভাবে মুসলমানরা "ডক্টর খারের" সাথে কথোপকথন করছিল। এ দৃশ্য আমার জন্য ছিল অসহনীয়। বিশ্বাস করুন, হায়দরাবাদে পৌছে কয়েক রাত্র পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারিনি। মনে মনে বলতে লাগলাম, "হে খোদা এ দেশে মুসলমানদের কি দুর্দশা হতে যাচ্ছে?" যাহোক এ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি তখন 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' (রাজনৈতিক সংঘাতের কবলে মুসলমান) প্রথম খণ্ড রচনা করি। [১]

---

(১) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমি ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় উত্তর ভারত সফর করি এবং এ সময় লাহোরে মরহুম আল্লামা ইকবালের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে হায়দরাবাদ থেকে পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হবার পরামর্শ দেন। তার মতে আমার অভীষ্ট কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ হায়দরাবাদে ক্রমশ কমে যাবে এবং তার জন্য পাঞ্জাবই সবচাইতে বেশী উপযোগী হবে। তাঁর পরামর্শ আমার মনমত হয় এবং অবিলম্বে তা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে আমি চিরতরে হায়দারাবাদ ত্যাগ করে পাঞ্জাব চলে আসি। এখানে এসে প্রথমে আমি সিদ্ধান্ত করি যে, প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষিত মেধাবী যুবকদেরকে এক জায়গায় রেখে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে সমাজে নতুন নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবো। কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি আমাকে সে স্কীম পরিবর্তন করতে বাধ্য করে।

কংগ্রেসের ভূমিকা

১৯৩৮ সালে আমি লক্ষ্য করলাম যে, কংগ্রেস ১৯২৯ সালে যে নীতি ঘোষণা করেছিল অর্থাৎ "মুসলমানরা আসতে চায় আসুক, নতুবা আমরা নিজেরাই আজাদী সংগ্রাম চালাবো", সে নীতি থেকে সে হঠাৎ এক পা সম্মুখে অগ্রসর হলো। এরপর যে নতুন নীতি গ্রহণ করা হলো তা হচ্ছে, মুসলমানদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে কংগ্রেসে ভর্তি করতে হবে এবং মুসলমানদের কোনো দলের সাথে দলগতভাবে কোনো আলোচনাই করা হবেনা। এ উদ্দেশ্যে 'মুসলিম গণ সংযোগ' (Muslim mass contact) অভিযান শুরু করা হয়। 'মুসলিম কম্যুনিস্টরাই' ছিল এ অভিযানের আসল কর্মী। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, এ কাজে আলেমদের একটি গোষ্ঠিও কংগ্রেসের সাহায্য করতে থাকে। আলেমদের এ গোষ্ঠির মত ছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান মিলে এক জাতি গঠন করতে পারে এবং সে এক জাতি এমন একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করতে পারে, যাতে সংখ্যাগুরুরা চূড়ান্ত ফায়সালা করার অধিকারী হবে। এ অবস্থা দেখে আমি ১৯৩৮ সালে 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' দ্বিতীয় খণ্ড এবং 'মাসয়ালায়ে কওমিয়াত' (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করি।

এ সময় আমার সর্বপ্রধান লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল যে, মুসলমানরা যাতে কোনো প্রকারেই তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র বিস্মৃত না হয় এবং অমুসলিম জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ দেশে যদি ইসলামকে বিজয়ী করে তোলা কারোর লক্ষ্য হয় তাহলে তার সঠিক চিন্তাধারা এ হওয়াই স্বাভাবিক যে, আমার কাছে আগে থেকে যে মূলধন রয়েছে তা যেন নষ্ট না হয়, উপরন্তু আমি যেন অধিক মূলধন অর্জন করতে সচেষ্ট হতে পারি। যারা আগে থেকে কালেমায়ে তাইয়্যেবায় বিশ্বাসী এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তারা যেন হাতছাড়া না হয়ে যায় এ চিন্তাই আমাদের সর্বাগ্রে করা উচিত। অন্যান্যদেরকে মুসলমান বানাবার কথা আমরা এর পরে চিন্তা করতে পারি। সুতরাং মুসলমানরা যেন অমুসলিম জাতির মধ্যে বিলীন না হয়ে যায়, তাদের মধ্যে যেন স্বতন্ত্র জাতীয়তার অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের অন্যজাতির সাথে মিলিত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়, তজ্জন্য আমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে চেষ্টা শুরু করি।

পাকিস্তান প্রস্তাব

এর পর এলো ১৯৩৯ সাল ও তার পরবর্তী যুগ। তখন মুসলিম লীগের আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হয়ে উঠেছিল। এ সময় পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হতে থাকে এবং ১৯৪০ সালে তা পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপ পরিগ্রহ করে। এ সময় আমার নিকট যে কাজ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা যে, তারা অন্যান্য জাতির মত নিছক একটি জাতি মাত্র নয় এবং একটি জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না বরং তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা।

মুসলমান হচ্ছে একটি প্রচারক জাতি, একটি মিশনারী জাতি, তাদের মিশন কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের উচিত এমন একটি রাষ্ট্র কায়েম করা যা দুনিয়ার বুকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হবে।

আমি তখন স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম যে, মুসলিম জাতি এখন খোদার ফজলে হিন্দু জাতির মধ্যে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। তার মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তার অনুভূতি এত মজবুত হয়ে গেছে যে, কোনো গান্ধী বা নেহেরুর সাধ্য নেই যে তাকে হিন্দুদের বা হিন্দুস্তানী জাতীয়তার মধ্যে বিলীন করে দিতে পারে। এখন আমার কাছে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল, তা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র কাকে বলে, তা কায়েম করার জন্য কি ধরনের চরিত্র প্রয়োজন, কি ধরনের আন্দোলন দ্বারা তা কায়েম করা হতে পারে এবং ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক ও কার্যত কি কি পার্থক্য বিদ্যমান সে সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে সার্বিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে আমি পুনরায় কতিপয় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি যা 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' তৃতীয় খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়। এর অধিকাংশ প্রবন্ধ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ সালে লিখিত হয়, কয়েকটি প্রবন্ধ ১৯৪১ সালেও লিখিত হয়।

আজ আমার এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে যার যা খুশী তাই বলুক, আমি এ সবের কোনোই পরোয়া করি না। আমি পূর্ণ সততার সাথে এখনো বিশ্বাস করি যে, তখন এটাই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। শুধুমাত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করাই মুসলমানদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় বরং একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী প্রয়োজনীয় চরিত্র নিজেদের মধ্যে গড়ে তোলা উচিত। এ কথা যদি আমি মুসলমানদেরকে বুঝাবার চেষ্টা না করতাম তাহলে আমার কর্তব্যে অবহেলা করা হতো।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

কিন্তু যখন আমি অনুভব করলাম যে, আমাদের সব চেষ্টা অরণ্যে রোদন তুল্য হচ্ছে তখন আমি একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, এ দলে চরিত্রবান লোকদের সমাবেশ ঘটবে এবং তারা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদ ও বিভ্রান্তিসমূহের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। বস্তুত এ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ আমার সামনে উন্মুক্ত ছিলনা। যে সময় পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৪০ সালে যখন পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয় তখনো কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে সক্ষম ছিলনা যে, দেশ নিশ্চয়ই ভাগ হয়ে যাবে এবং পকিস্তান অবশ্যই কায়েম হবে।

এমনকি ১৯৪৭ সালের শুরুতেও 'পাকিস্তান হবেই' এমন ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করতে পারেনি। এ সময়ে আমার সামনে যে প্রশ্নগুলো সবচেয়ে গুরুত্ববহ ছিল তা হচ্ছে, পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছিল তাতে এক অবস্থা এ হতে পারতো যে, পাকিস্তানের জন্য চেষ্টা করে মুসলিম লীগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারতো এবং ইংরেজ জাতি এক জাতিত্বের ভিত্তিতে ভারতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে তাকে হিন্দুদের হাতে সমর্পণ করে চলে যেতে পারতো। যদি তাই হয় তা হলে আমাদের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করা উচিত?

দ্বিতীয় অবস্থা হতে পারতো মুসলিম লীগ তার উদ্দেশ্য কামিয়াব হয়ে যেতে পারে এবং দেশ বিভক্ত হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে যে কোটি কোটি মুসলমান ভারতে থেকে যাবে তাদের কি দশা হবে? আর খোদ পাকিস্তানে ইসলামের কি অবস্থা হবে? যে ধরনের লোকেরা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করছিল তাদের দেখে আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, এসব লোক একত্রিত হয়ে একটি দেশ গড়তে পারে, একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে পারে, কিন্তু তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবে এমন আশা কিছুতেই তাদের কাছ থেকে করা যেতনা। এক বা একাধিক ব্যক্তির ব্যতিক্রম থাকায় কিছু আসে যায়না, আসল ব্যাপার হলো যারা এ আন্দোলনে শামিল হচ্ছিল, যারা এতে অগ্রণী ছিল, যারা এ আন্দোলন পরিচালনা করছিল তাদের চরিত্র তাদের জীবন, তাদের শিক্ষা ধ্যানধারণা ও অন্যসব জিনিস দেখে তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র ছিল। এ সব দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তারা একটি দেশ গড়তে পারলেও ইসলামী রাষ্ট্র গড়তে পারবে না।

তখন মোটের ওপর তিনটি প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথমত দেশ বিভক্ত না হলে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য কি করা যেতে পারে? দেশ বিভক্ত হলে যে সব মুসলমান ভারতে থেকে যাবে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা দরকার? দেশ

বিভক্ত হলে যে দেশ মুসলমানদের অংশে পড়বে তাকে মুসলমানদের পরিচালিত অনৈসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া থেকে কি করে রক্ষা করা যায় এবং তাকে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসবে গড়ে তোলার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত?

এ সব প্রশ্নের জবাবেই আমি জামায়াতে ইসলামী নামে দল গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ইতিপূর্বে কয়েক বছর ধরে আমি যে সব মতামত প্রকাশ করে আসছিলাম, তার কারণে যদিও বিভিন্ন মহল থেকে আমাকে গালিও দেয়া হচ্ছিল কিন্তু বহুলোক সেসব মতামতের সমর্থক ছিল এবং তাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করতো। এ সব লোকের সমর্থন ও সহযোগিতায় জামায়াত কায়েম করা হয়। আমি আগেই বলেছি যে, এ পরিকল্পনা হঠাৎ আমার মস্তিষ্কে গজিয়ে ওঠেনি বরং ২২ বছর ধরে আমি যে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বানুসন্ধান করেছিলাম এবং তা থেকে যে সব সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছিলাম তারই ভিত্তিতে জামায়াত গঠিত হয়েছিল। এখন আমি এক এক করে সেসব সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করবো যা আমি আমার অবিশ্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে অর্জন করেছি।

আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, ১৯২৫ সাল থেকেই আমি এ বিশ্বাস পোষণ করতাম যে একটি মিশনারী জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের মুক্তি নিহিত হয়েছে। মুসলিম জাতি হিসেবে পৃথিবীতে তার একটি মিশন ও লক্ষ্য রয়েছে এবং অন্যান্য জাতির মত মুসলমানরা একটি সাধারণ জাতি মাত্র নয় সে কথা তাঁর বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ জন্য আমি সর্বপ্রথম এ সংকল্প গ্রহণ করলাম যে, যাদের মধ্যে এরূপ মিশনারী প্রেরণা বিদ্যমান, যারা নিজেদেরকে একটি মিশনারী তথা আন্দোলনমুখী জাতির অংশ বলে মনে করে এবং মুসলিম জাতিকে একটি আন্দোলনমুখী জাতিতে পরিণত করতে সংকল্পবদ্ধ, তাদেরকে সংঘবদ্ধ করবো।[১]

১। আমার মতে তখনকার ভারতের মুসলমানদের সমস্যাবলীর এটাই ছিল প্রকৃত সমাধান। অমুসলিম সংখ্যাগুরুর মধ্যে একটি মুসলিম সংখ্যালঘুর অবস্থান, তদুপরি সংখ্যাগুরুর শাসন ভিত্তিক গণতন্ত্র এমন একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছিল যে, পৃথক নির্বাচন ও শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা দ্বারা তার সমাধান করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে জাতীয় সত্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মুসলমানরা লড়াই করে জয়লাভ করতে পারতোনা। সুতরাং এর একমাত্র সঠিক সমাধান হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে মিশনারীসুলভ গুণাবলীর সৃষ্টি করা। এটি সেদিনও একমাত্র সমাধান ছিল আর আজও একমাত্র সমাধান। এ কর্মপন্থার বদৌলতেই উপমহাদেশে ইতিপূর্বে কোটি কোটি অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এরই বদৌলতে উপমহাদেশে এমন দুটো ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন যা পাকিস্তানের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য

আমি একথাও আগে বলেছি যে ১৯২৬ সালে যখন আমি স্বীয় গ্রন্থ 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' রচনা সম্পন্ন করি তখন থেকেই আমার মন মস্তিষ্কে এ বিশ্বাস অত্যন্ত মজবুতভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই মুসলমানদের জীবনের মূল লক্ষ্য। একটি নিছক জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম করা তাদের লক্ষ্য নয় বরং দুনিয়ার সামনে আল্লাহর বিধানের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে পারে এমন একটি বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করাই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা ও নৈতিক পরিবেশ যেখানে খাঁটি ইসলামের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, যার আইন আদালত, ফৌজ পুলিশ ও দূতাবাস পৃথিবীর সামনে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরবে, সে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করাই প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এরূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে কি পার্থক্য এবং ইসলাম সর্ব দিক দিয়ে সকল মানব রচিত সভ্যতা ও মতবাদের চাইতে কত উচ্চ ও উৎকৃষ্ট তা জগতবাসী সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। মুসলমানদের এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকেই আমরা জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। ইসলামের পরিভাষায় একে বলা হয় ইকামতে দ্বীন বা আল্লাহর বিধানের বাস্ত বায়ন। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

"তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করো এবং এ ব্যাপারে বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।"

এ সঙ্গে আমি জামায়াত গঠন করার ব্যাপারে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেছি তা হচ্ছে, যেসব লোক জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা যেন শুধু আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারেই নিষ্ঠাবান হবে না বরং চরিত্রের দিক দিয়েও নির্ভরযোগ্য হবে। দীর্ঘ ২২ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ শিক্ষা লাভ করেছিলাম যে, ভালো লোকের সাথে সাথে অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য লোক ঢুকে পড়ার কারণেই মুসলমানদের বিভিন্ন আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সাংগঠনিক মজবুতির আবশ্যকতা

খেলাফত আন্দোলনে বহু সচ্চরিত্র জ্ঞানী গুণী ও মহৎ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল কিন্তু তার মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী বিপুল সংখ্যক কর্মীও শামিল হয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা আন্দোলন ও আন্দোলনের মহান

নেতৃবৃন্দের অপযশ ঘটিয়েছিল। মুসলমানরা লাখ লাখ টাকার চাঁদা সংগ্রহ করে এসব মহৎ কাজের জন্য দান করেছিল কিন্তু তার একটি বিরাট অংশ এসব অসাধু কর্মী আত্মসাৎ করে এবং এর ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলমানদের কাছে চাঁদার নাম উচ্চারণ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ জনগণের নিকট থেকে চাঁদা নিয়ে কাজ করা কর্মীদের ওপর তাদের এত অনাস্থা এসে গিয়েছিল যে, নিষ্ঠাবান সৎ কর্মীরাও যদি কোনো ভালো কাজের জন্য চাঁদা চাইতো তাহলেও লোকে ভাবতো, এরা চাঁদার অর্থ খেয়ে ফেলবে।

এসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে; কর্মীর সংখ্যা বেশী হওয়াটাই বড় কথা নয় বরং নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী কর্মীদের গুরুত্বই সর্বাধিক। তাই সংখ্যায় কম হলেও আমাদের দলে শুধু বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রের লোকদেরই প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

আমাদের দলের লোকদের চরিত্র এত নিখুঁত হওয়া চাই যে তাদের কথা ও কাজে যেন সামঞ্জস্য থাকে এবং লোকে বিশ্বাস করতে পারে, তাদের হাতে যেন লোকেরা নিশ্চিন্তে টাকা পয়সা দিতে পারে এবং যে কাজের উদ্দেশ্যে টাকা নেয়া হলো সে কাজেই তা ব্যয় হবে, এ ব্যাপারে যেন জনগণের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে।

আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আরো একটি সত্যের সন্ধান পাই তা হচ্ছে, মুসলমানদের আন্দোলনগুলো যে ব্যর্থ হতে দেখা যায় অথবা প্রথমে সফলকাম হয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, তার একটি অন্যতম কারণ হলো সাংগঠনিক দৃঢ়তার অভাব। আমি তাই ফয়সালা করলাম যে, জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠিন হতে হবে, এতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বরদাশত করা চলবেনা, চাই দলের কেউ থাক বা না থাক। সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিও যদি দল ত্যাগ করে চলে যায় তা যাক, তবু সংগঠনে শিথিলতা আসতে দেয়া যাবে না। কেননা একটি এবড়ো থেবড়ো দল কখনো সুসংগঠিত বাতিল শক্তির মোকাবেলা করতে পারে না। পক্ষান্তরে একটি ক্ষুদ্র দল যদি সুসংগঠিত হয় এবং কর্মকুশলতার সাথে কাজ করে তাহলে তা একটি গোটা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আপনি লাখ লাখ মানুষ জমা করে ফেলুন, যদি তার মধ্যে অটুট শৃঙ্খলা ও সংগঠন না থাকে তাহলে সে জনসমাবেশ কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারবে না। এ জন্য আমরা জামায়াতে যোগদান করার জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করি। ইসলামের দৃষ্টিতে সে মানদণ্ড হবে মুসলমান হওয়ার ও মুসলমান থাকার ন্যূনতম শর্ত। আমরা এর মধ্যে মনগড়া বিষয় সংযোজন করিনি। কেবল মুসলমানদের ওপর আল্লাহ যে

কাজগুলোকে ফরজ হিসাবে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন আমাদের প্রত্যেক সদস্যকে তা কড়াকড়িভাবে পালন করে চলতে হবে। এ ফরজ কর্তব্যগুলো পালনের ব্যাপারে কোন শিথিলতা বরদাশত করা হবেনা। অনুরূপভাবে ইসলামে যে বিষয়গুলো হারাম করা হয়েছে, আমাদের সদস্যদের কেউ তার কোনো একটাও লংঘন করতে পারবেন না। আপনি যখন লোকদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে চান, তখন আপনি নিজেই অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে আপনার নসিহত কে শুনবে? [১]

অবশ্য জামায়াতের সদস্য ছাড়াও সমাজে বহু লোক রয়েছেন যারা আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পছন্দ করেন এবং আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চান কিন্তু তারা সদস্যপদের বাধ্যবাধকতা ও জামায়াতের নিয়ম শৃংখলা পুরোপুরিভাবে পালন করতে প্রস্তুত নন, তাদের জন্যও আমরা একটি ব্যবস্থা করেছি। তাঁদেরকে আমরা মুত্তাফিক (সমর্থক) হিসেবে নিজেদের সাথী করে নেয়ার সিদ্ধান্ত করেছি, যাতে শারীরিক আর্থিক ও নৈতিক যে ধরনের যতটুকু সহযোগিতাই তারা করতে সক্ষম তা মুত্তাফিক থেকে জামায়াতের সংগঠন ও শৃংখলায় হস্তক্ষেপ না করেই তারা করতে পারেন। এভাবে আমরা জামায়াতের সাথে সংযুক্ত লোকদের দু'শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছি। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি আপত্তি তোলা হচ্ছে। বলা হয় এ দলটির সংগঠন এক অদ্ভুত ধরনের, সদস্য মাত্র কয়েকজন আর সবই মুত্তাফিক। অথচ শুধু দাঁড়ানো দর্শকরাই এ আপত্তি তুলে থাকেন। খোদার রহমতে আমাদের মুত্তাফিকগণ জামায়াতের এ শৃংখলাকেই নির্ভুল মনে করেন। আসল ব্যাপার হচ্ছে, কোনো মুত্তাফিকের জন্য আমাদের দলের সদস্য হওয়ার পথ রুদ্ধ নয়। যখনই তারা ইচ্ছে করেন সদস্য হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে এবং জামায়াতের শৃংখলাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত দিতে পারেন।

আমাদের মুত্তাফিকেরা জামায়াতের সদস্যভুক্ত হোন এটা তো আমাদেরই কাম্য। তারা যে সদস্য ও জামায়াতের নিয়ম শৃংখলা পালনের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করতে নিজেদেরকে অপারগ মনে করছেন সেটা নিজস্ব অসুবিধের কারণেই।

---

(১) জামায়াতের সংগঠন চালাবার জন্য আমরা যথারীতি একটি গঠনতন্ত্রও রচনা করেছি এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। এটি আমরা কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলি এবং জামায়াতের কাউকেই এর বিরুদ্ধাচরণ করার অনুমতি দিই না। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করলে সে সদস্যকে হয় নিজের কাজকর্ম সংশোধন করতে হয় নতুবা জামায়াত ত্যাগ করতে হয়।

এ জন্য তারা কায়িক, আর্থিক ও নৈতিক ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল উপায়ে জামায়াতের সহযোগিতা করে চলেছেন, তাদেরকে মুত্তাফিক বানিয়ে রাখা হলো কেন, এমন অভিযোগ তাদের পক্ষ থেকে কখনো ওঠেনি।

জামায়াতে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষিতদের অপূর্ব সমাবেশ

একই সংগঠনের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদের সমন্বয় সাধন করে উভয় শ্রেণীকে মিলিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, এও ছিল জামায়াত গঠনকালে আমাদের চিন্তার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। পূর্বতন অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বিশ্বাস করতাম যে, শুধুমাত্র আধুনিক শিক্ষিত লোকদের একটি দল, তা সে ইসলামের ব্যাপারে যতই নিষ্ঠাবান হোকনা কেন, ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও নির্ভুল জ্ঞানের অভাবে একটি ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হবেনা। অনুরূপভাবে শুধু মাত্র ইসলামী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যদিও ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানও রাখেন তবু বর্তমান যুগে একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে ধরনের জ্ঞান প্রয়োজন, সে জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে শুধু তাদের নিয়ে গঠিত একটি খালেস ধর্মীয় দল ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা অথবা একটি আধুনিক রাষ্ট্রকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালনা করা, এ দুয়ের কোনোটাই করতে সক্ষম নয়। এসব কারণে আমার মতে উক্ত দু'গোষ্ঠিকে একত্র করাই অপরিহার্য ছিল।

আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যারা শুধু আন্তরিকভাবে মুসলমানই নয় বরং ইসলামের হুকুম আহকাম অনুসারে কাজ করতেও কৃতসংকল্প, যাদের মনমগজ এত পাক্কা মুমিন যে কোনো বিষয়কে মনে প্রাণে গ্রহণ করার জন্য তারা সে বিষয়ের যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া জরুরী মনে করেনা এবং সেটা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নির্দেশ, এটুকুই তারা চূড়ান্ত দলীল হিসেবে যথেষ্ট বলে মনে করে আর যখন পরিষ্কারভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের হুকুম বলে উপলব্ধি করতে পারে তখন তারা নির্বিবাদে তার সামনে মস্তক অবনত করে দেয়। এ ধরনের আধুনিক শিক্ষিত প্রার্থীদের আমরা জামায়াতের সদস্যভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অনুরূপভাবে দীনদার আলেম সমাজের মধ্যে ফের্কাগত সংকীর্ণতায়

নিমগ্ন নন এবং যারা অনুভব করেন যে, এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য তাদের আধুনিক শিক্ষিতদের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করা উচিত, তাদেরকেও আমরা জামায়াতের সংগঠনে শ্যামিল করে দেই।[১]

মজহাব ও ফের্কা লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায় নয়

প্রত্যেক ফের্কা ও মজহাবের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ জামায়াতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা, কোরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস বলে স্বীকার করাই যে প্রকৃত ইসলাম তা সুস্পষ্ট। তাই যে ব্যক্তি এদুটিকে আইনের উৎস বলে স্বীকার করে, সেই মুসলমান।[২]

কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর হুকুম ও ভাষ্যের একটি মাত্র ব্যাখ্যা হতে পারেনা বরং বিভিন্ন রকমের একাধিক ব্যাখ্যাও সম্ভব। এটা শুধু সম্ভবই নয় বরং বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করাও হয়েছে যার কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মজহাবের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমাদের উচিত নিজেদের মধ্যে উদার ও মহান মনোভাব গড়ে তোলা। যে মজহাবের লোকেরা যে ব্যাখ্যা সঠিক মনে করবে, সেটা নিজেরাই পালন করে চলবে এবং অন্য মজহাবের লোকদের ওপর নিজের ব্যাখ্যা জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করবেনা বরং অন্য মজহাবের লোকরা যে ব্যাখ্যা সঠিক মনে করে, সে অনুসারে তার কাজ করার অধিকার স্বীকার করে নেয়। কেবলমাত্র এভাবেই আমাদের একত্রে কাজ করা সম্ভব নতুবা একত্রে কোনো কাজ করা এবং সারা দেশে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ব্যবস্থা কায়েম করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

বস্তুত মজহাবী মতপার্থক্য আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং তার ভিত্তিতে নিজেদেরকে পৃথক পৃথক সংগঠন কায়েম করা উচিত হবে না।

১। আধুনিক ও প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষিত লোকদের মিলিত করে এই চিন্তা ও একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যৌথ নেতৃত্ব সরবরাহ করা একমাত্র জামায়াতে ইসলামীরই কৃতিত্ব। নচেৎ ইতিপূর্বে যখনই আলেমগণ আধুনিক শিক্ষিতদের জোটভুক্ত হয়েছেন, কেবল একটি পরিপূরক শক্তি হিসেবে হয়েছেন। নেতৃত্বে তাদের কোনো অংশ ছিল না। একদল গিয়েছেন কংগ্রেসে আরেক দল মুসলিম লীগে। কিন্তু কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট আলেমদের কোনো হাত ছিল না, তারা শুধু নিজ নিজ সমর্থিত দলের পেছনে মুসলমানদের সমর্থন সংগ্রহ করার কাজ করেছেন।

২। অবশ্য কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়। কেননা তারা কোরআন সুন্নাহকে স্বীকার করলেও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে শেষ নবী স্বীকার না করে কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিই নষ্ট করে দিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী মুসলমানদের প্রত্যেক মজহাবের লোকদের ওপর জোর দিয়েছে যে, তাদের সর্বপ্রথমে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা ও সে উদ্দেশ্যে একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আন্দোলন চালানোর ব্যাপারে একমত হতে হবে। এভাবে জামায়াত প্রত্যেক ফের্কা ও মজহাবের লোকদেরকে দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে আহলে হাদিস, বেরলবী, দেওবন্দী প্রভৃতি রয়েছেন। শিয়া মহোদয়দের মধ্যে কেউ কখনো সদস্যভুক্ত না হলেও তাদের মধ্যে থেকে বিপুল সংখ্যক মুত্তাফিক এতে শামিল রয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী গঠিতই হয়েছে এ নীতির ভিত্তিতে যে, যার যে মজহাব রয়েছে, সে সেই মজহাব অনুযায়ী কাজ করে যাবে, তবে অন্যের ওপর তা জোরপূর্বক চাপাতে পারবে না। যে কাজকে আপনি সঠিক মনে করেন না অন্যেও তা সঠিক মনে করবে না, এ দাবী আপনি করতে পারেন না। আপনি নিজে তা নিশ্চিন্তে পরিহার করে চলুন। এর পরে আসুন আমরা সবাই মিলে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি।

ইসলামী চরিত্র গঠনের অমোঘ পন্থা

এবারে আমি জামায়াতে যোগদানকারীদের ট্রেনিং এর জন্য আমরা কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি, তার ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করবো। আমরা ট্রেনিং কেন্দ্রও খুলি এবং জামায়াত কর্মীদেরকে ইসলামী পুস্তিকাদিও পড়তে দিই, যাতে করে ইসলামকে তারা ভালোভাবে বুঝতে ও জানতে পারেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আসল ট্রেনিং হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং মানুষের সামনে আল্লাহর দীনকে তুলে ধরা। এ কাজ যখন কেউ করতে আরম্ভ করে তখন তার চরিত্রের যে কোনো দিকে যদি কোনো দুর্বলতা দেখা যায়, তখন মানুষ তার সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে ওঠে, "নিজের মধ্যে এ দোষ নিয়ে আমাদের নসিহত করতে এসেছে বুঝি?" এ এমন এক ট্রেনিং যা ইসলামের দাওয়াত দানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন লাভ করবে। সব দিক থেকে লোকেরা তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে এবং শেষ পর্যন্ত সে একজন খাঁটি মুসলমান হবে। এমনিভাবে আত্মশুদ্ধির জন্যও আমাদের একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে গালি শুনতে হবে কিন্তু কারো গালির জবাবে গালি দেয়া চলবে না। অপরে মিথ্যা অপবাদ রচনা করবে কিন্তু তার জবাবে মিথ্যা অপবাদ রচনা করা যাবে না। নানা রকমের প্রলোভন আসবে কিন্তু কোনো প্রলোভনে পড়ে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। আর যত বিপদ মুসিবত ও ক্ষতি

লোকসান আসুক তা হাসিমুখে বরদাস্ত করতে হবে। ভয়াল শক্তিসমূহ ভীতি প্রদর্শন করতে থাকলেও ভীত হয়ে হেদায়েতের পথ পরিত্যাগ করা চলবে না। এ হচ্ছে আমাদের আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি। আমার মনে হয় এর চাইতে কষ্টকর আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি আর কিছু থাকতে পারে না। এ আত্মশুদ্ধি হুজরা ও খানকায় বসে সম্ভব নয় এবং সংগ্রামের ময়দানে নেমেই সম্ভব।

আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি

সাধারণভাবে আমাদের বিরোধীরা আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, জামায়াতে ইসলামী নাকি একটি ফ্যাসিবাদী দল এবং এর অভ্যন্তরে নাকি গণতন্ত্রের নাম নিশানাও নেই অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে যতখানি গণতন্ত্র রয়েছে তা সম্ভবত দুনিয়ার কোনো দলের মধ্যেই নেই। কিন্তু জামায়াতের মধ্যে যেহেতু অন্যান্য দলের মত কর্মকর্তা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন প্রার্থী দাঁড়ানো, পদ নিয়ে টানাটানি, পদ না পাওয়ায় ঝগড়া বিবাদ করে দলত্যাগ কিংবা দলের মধ্যে থেকে কোন্দল পাকানো প্রভৃতির কথা তারা কখনো শুনেনি তাই তারা অবাক হয়ে ভাবে যে, এ আবার কি ধরনের দল। লোকেরা যেহেতু বিভিন্ন দলের মধ্য এ দৃশ্যই দেখতে অভ্যস্ত অথচ জামায়াতের মধ্যে দেখতে পায় না। তাই অনুমান করতে আরম্ভ করে যে, এতে বোধ হয় কোনো সম্পূর্ণ ফ্যাসীবাদী পন্থায় পদ বন্টন করা হয়। অথচ বাস্তব ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

জামায়াত শুরু থেকেই তার সংগঠনকে স্বার্থপরতামুক্ত এবং কর্মীদেরকে সৎ ও নিঃস্বার্থ রাখার জন্য কতিপয় স্থায়ী বিধি নির্ধারিত করে রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিধি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কখনো নিজে কোনো পদের প্রার্থী হবে না, পদ লাভের জন্য ক্যানভাস অথবা অন্য কোনো প্রকার চেষ্টা চালাবে না। এমন কি যদি কারুর মধ্যে বিন্দুমাত্র পদলোভের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় অথবা কোনো পদ না পাওয়ায় মর্মাহত বলে মনে হয়, তাহলে তাকে কোনো পদের উপযুক্ত তো ধরাই হবে না, অধিকন্তু তার সদস্যপদের যোগ্যতাও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে।

জামায়াতের আমীর থেকে শুরু করে নিম্নতম পদসমূহের সব ক'টির নির্ধারণের জন্য সদস্যদের নিকট সরাসরি ব্যালট প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উক্ত সদস্যদের নিকট যিনি যোগ্যতম প্রার্থী তার নাম লিখে দিতে বলা হয়। এর জন্য কোনো ক্যানভাস নেই, কেউ কারুর কাছে গিয়ে ভোটপ্রার্থনা করতে পারে না এবং কেউ কারুর পক্ষে সুপারিশও করতে পারে না। যোগ্যতম প্রার্থী বাছাই

সম্পূর্ণরূপে ভোটদাতার এখতিয়ারভুক্ত। সে মনোনীত প্রার্থীর নাম লিখে ব্যালট ডাক মারফত পাঠিয়ে দেয় এবং তারপরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়। এইরূপ ব্যালটের মাধ্যমেই আমাদের এখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সাংগঠনিক ত্রুটি দূরকরণের পন্থা

জামায়াতের সংগঠনকে ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য আমরা সমষ্টিগত মোহাসাবা অর্থাৎ সমালোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা রেখেছি। এতে খোলাখুলিভাবে ভুল ধরা হয়, সদস্য হোক কিংবা কর্মকর্তা, সকলেরই বেপরোয়া সমালোচনা চলে। প্রত্যেক ভুলের সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। জামায়াত সদস্যদের সম্মেলনে আমি সর্বপ্রথম নিজেকে সমালোচনার জন্য পেশ করেছি। আমি আমার কর্মীদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছি আমার ওপর যে আপত্তি থাকে, যে অভিযোগ থাকে বলুন, আমি সকলের সামনে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো। কোনো কোনো সময় আমার ওপর সম্মেলনে ও বৈঠকাদিতে এত কঠোর সমালোচনা হয়েছে যে নতুন সদস্যরা তা দেখে আঁতকে উঠেছে যে, একি ব্যাপার। এত লোকের মধ্যে জামায়াত প্রধানকে এমন নির্মমভাবে পাকড়াও করা হচ্ছে। কিন্তু আমি তাদেরকে এ বলে বুঝিয়েছি যে, ভাই, এ পন্থায় তো আমরা আমাদের দলকে সুপথে রাখতে পারি। আপনারা এতে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমি যদি আমার দলের লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে না পারি তাহলে এ দল পরিচালনার আমি যোগ্য নই। আমার সমালোচনা করা তাদের অধিকার আর তাদেরকে সন্তুষ্ট করা আমার দায়িত্ব। তাদের যদি কোনো ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে তাহলে আমি তাদেরকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করবো আর যদি তাদের অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমি ত্রুটি স্বীকার করে নিজেকে সংশোধন করবো। এ পন্থায় আমরা এ যাবত আমাদের দলকে ত্রুটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করছি।

আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি

এবার জামায়াতের পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো। জামায়াতের সমস্ত ইতিহাসে মাত্র দুবারই অধিকাংশের ভোট নিয়ে ফায়সালা করতে হয়েছে। নচেৎ এযাবত আমরা সর্বসম্মতভাবেই সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। মজলিসে শুরার মাত্র একজন সদস্য আমাদের সকলের মতামতে সন্তুষ্ট

হতে পারেননি বলে আমি অনেক সময় কয়েকদিন পর্যন্ত একই ব্যাপারে আলোচনা অব্যাহত রেখেছি। এমন বহুবার হয়েছে যে, মজলিসে শুরার সদস্যরা আলোচনার দীর্ঘ সূত্রিতায় অতিষ্ঠ হয়ে দাবী করে বসতেন যে, ভোট গ্রহণ করে অধিকাংশের মতানুসারে ফায়সালা করা হোক। কিন্তু আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি যে, আমরা যে কাজ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, তার জন্য সমগ্র জামায়াতের পূর্ণ ঐকমত্য সহকারে চলা প্রয়োজন। এ জন্য মজলিসে শূরার কোনো এক ব্যক্তির মনেও যদি কোনো সংশয় থেকে থাকে তবে তা দূর করার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করুন। আর কেবলমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায়ই ভোট নিয়ে ফায়সালা করুন। এ জন্য আমাদের মজলিসে শূরায় যখন যে ফায়সালা হয়েছে সমগ্র জামায়াত পূর্ণ আত্মতৃপ্তির সাথে তা বাস্তবায়িত করেছে।

জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরাকে জামায়াত সদস্যরা তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন করে। এতে কোনো এক ব্যক্তি মনোনীত হন না। বর্তমান মজলিসে শূরার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আলেমের সংখ্যা ৫ জন, বি এ ৩ জন, এম এ ২ জন এবং ইঞ্জিনিয়ার ১ জন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলেম ১৭ জন, বি এ ৫ জন, বি এ বি এড ১ জন, এল এল বি ২ জন, এম এ ১ জন, এম কম ১ জন এবং বি এস সি এগ্রি ১ জন। এ পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মজলিসে শূরায় আলেম ও আধুনিক শিক্ষিতদের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এবং তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় জামায়াত পূর্ণরূপে সমর্থ

এমনিভাবে জামায়াত জাতীয় পরিষদের জন্য যেসব প্রার্থী মনোনীত করেছে তাদের মধ্যে কি ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক রয়েছে তাও আমি আপনাদের সামনে ব্যক্ত করছি। অনেকে বলে বেড়াচ্ছেন যে, এ মৌলবীরা কি করে দেশ চালাবে? এবার এ মৌলবীগুলোর তালিকা দেখুন এবং চিন্তা করুন যে এরা দেশ চালাতে পারে কিনা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে ১৭ জন আলেম, ১৬ জন বি এ, ১ জন ইঞ্জিনিয়ার, ১ জন ব্যারিষ্টার, ৩১ জন এল এল বি এবং ২১ জন এম, এ।

আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৩ জন আলেম, ১২ জন এল এল, বি, ১৭ জন এম এ, এম, এস সি, ও এম কম, ১২ জন বি এ ও বি, এস সি, ২ জন ইঞ্জিনিয়ার ও ২ জন এম, বি, বি, এস, ১ জন অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল, ১ জন অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ও ৩ জন অবসর প্রাপ্ত মেজর রয়েছেন।

এরা বর্তমান যুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাইতে বিদ্যাগত যোগ্যতার দিকদিয়ে কোনো অংশে কম নন। অন্তত অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সমান দক্ষতার সাথেই এ'রা দেশ পরিচালনা করতে পারবেন। তবে পার্থক্য হচ্ছে আমাদের এ টীমের মধ্যে ওলামাও রয়েছেন, যারা তাদেরকে প্রত্যেক পদে পদে ইসলামের হুকুম আহকাম সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারবেন। এ আলেম ও আধুনিক শিক্ষিত প্রার্থী দলের মধ্যে পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বিদ্যমান যে, তারা পাকিস্তানকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি আধুনিকতম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে পূর্ণরূপে সমর্থ। এ ছাড়া আর একটি বিষয়ের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, তা হচ্ছে আমাদের জামায়াতের সংগঠন সারা দেশে পরিব্যাপ্ত। দেশের কোনো অংশ এমন নেই যেখানকার লোক জামায়াতে শামিল হয়নি। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচী, সিন্ধী, ব্রোহী মোটকথা পাকিস্তানের জনসংখ্যার সকল উপাদান এর মধ্যে শামিল রয়েছে। দেশের কোনো অংশের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কোনো ফায়সালা করা এর পক্ষে সম্ভব নয়। এটা কোনো সীমিত বা অঞ্চল ভিত্তিক দল নয় এবং কোনো বিশেষ এলাকার ভাবাবেগকে জাগিয়ে তুলে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসছে না। যেমন দল বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে এবং নিজ নিজ এলাকার ভাবাবেগকে জাগ্রত করে আসছে, পরিষদে পৌঁছলে তারা দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করার সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করতে পারবে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এমন একটি দল, যার সংগঠন সারা দেশে বিস্তৃত এবং দেশের প্রত্যেক অংশের জনগণ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একথাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, জামায়াতে ইসলামী উনত্রিশ বছর আগে তার যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল, আজও সেটাই তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জামায়াত এ উনত্রিশ বছরের মধ্যে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে, একথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। সুতরাং সে ক্ষমতায় এলে এ দেশে ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু কায়েম করবে এটা কল্পনাও করা যায় না।

(এরপর মগরিবের নামাজের জন্য বিরতি হয়। নামাজের পর নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদত্ত হয়।)

অপপ্রচারকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

এবার আমি জামায়াতের ইতিহাস একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, (১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে) ৭৫ জন সদস্য এবং ৭৪ টাকা ১৪ আনা তহবিল নিয়ে জামায়াতের কাজ শুরু হয় (আর ২ আনা হলেই

টাকা ও সদস্য সংখ্যা সমান হয়ে যেত)। জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হবার দশ মাস পর আমরা কেন্দ্রীয় অফিস লাহোর থেকে বাইরে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ১৯৪২ সালের জুন মাসে আমরা পাঠানকোট থেকে ৪ মাইল দূরবর্তী গ্রাম দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হই।

যেহেতু এ সময় দেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এক দুর্বার আন্দোলন চলছিল। তাই শহরে বসে আমরা কাজ চালাই আর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ আন্দোলনের সাথে একটা দ্বন্দ্ব বেঁধে যাক তা আমাদের কাম্য ছিলনা, এজন্য আমরা শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

পাকিস্তান আন্দোলনের কোনো প্রকার বিরোধিতা করার কথা জামায়াতে ইসলামী কখনো কল্পনাও করেনি। আজ যে কোনো ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে যা খুশী অপবাদ রটাক কিন্তু জামায়াতের কোনো প্রস্তাব, কোনো সম্মেলনের কার্যবিবরণী এবং কোনো বিবৃতি থেকেই একথা প্রমাণিত হয়না যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল। আমরা শুধু চেয়েছিলাম কোনো নির্জন গ্রামে গিয়ে নিরিবিলিতে আমাদের সদস্য ও মুত্তাফিকদের ট্রেনিং দিতে ও সংগঠন মজবুত করতে। আমরা নিজেদেরকে পাকিস্তান আন্দোলনের সম্ভাব্য ব্যর্থতার পর সারা দেশে মুসলমানদের ওপর যে দুর্দশা নেমে আসবে, তার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করছিলাম। আর পাকিস্তান আন্দোলনের সাফল্যের পর ভারত মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার এবং পাকিস্তানে ইসলামের প্রতি যে ঔদাসীন্য প্রদর্শনের আশংকা ছিল, তা প্রতিহত করার জন্যও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাই আমরা নিজেদের ট্রেনিং ও সংগঠনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম, যা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোকনা কেন আমাদের সংগঠনকে যেন বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে না পারে এবং সংগঠন যেন যথারীতি কায়েম থাকে। আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশংকা রয়েছে, তা উদ্ভূত হবার পর এ ধরনের সংগঠন কায়েম করা সম্ভব হবে না। এ জন্য আমরা এ ৬টি বছর শুধুমাত্র আমাদের সংগঠন মজবুত করার কাজে ব্যয় করি। এ সাথে আমরা পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যও উপযোগী একটি কর্মপন্থা অবলম্বন করি। জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলনগুলো দেশের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠান করা এবং প্রত্যেক সম্মেলনের শেষে জাতি ধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য একটি জনসভার আয়োজন করা ছিল এ কর্মপন্থার একটি বিশেষ দিক। আমরা এ সব জনসভায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান মোটকথা প্রত্যেক জাতির লোককে ডেকে আনতাম এবং তাদের সামনে ইসলামের খালেস দাওয়াত পেশ করতাম। ইসলাম কি, তার মূলনীতি কি এবং সেসব মূলনীতি দ্বারা

মানব জাতির কল্যাণ সাধন কিভাবে সম্ভব, এ সব কথাই তাদেরকে আমরা ব্যাখ্যা করে বুঝাতাম।

অত্যন্ত ভয়াবহ সময়ে যখন হিন্দু ও মুসলমান এবং শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক দাংগা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখনো আমরা এ কাজ অব্যাহত রাখি। সে সময় জামায়াতে ইসলামীই একমাত্র দল ছিল যা ভারতের বিভিন্ন অংশে পরস্পর দাংগায় লিপ্ত জাতিসমূহকে এক সভায় মিলিত করতে পারতো এবং তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতো। আমরা এমন পন্থায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করতাম যে হিন্দু শিখ এবং ইসলামের কঠোর দুশমনও তা শুনতো।

১৯৪৭ সালে যখন দাংগা পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলো এবং সারা দেশে সাংঘাতিক রকমের হানাহানি চলতে লাগলো, তখন আমি শেষবারের মত ভারত সফর করি এবং বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেই। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজের একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি ভারতে মুসলমানদের অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ ও কর্তব্য অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করি। আমার সে ভাষণ জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে। আমি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ভারতের মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দেই যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এযাবত দু পায়ে খাড়া ছিল। তার এক পা হচ্ছে ইংরেজের মোকাবেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম আর দ্বিতীয়টি হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা। দেশ বিভাগের পর এর একটা আপনা আপনি খসে পড়বে। কেননা ইংরেজ জাতির মোকাবেলায় অযাদী সংগ্রামের আর প্রয়োজন থাকবে না। এরপর এ জাতীয়তা শুধু এক পায়ে খাড়া থাকবে আর তা হচ্ছে মুসলিম বৈরিতা। হিন্দু জাতীয়তাবাদ তার এ পাটা বহাল রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এ জন্য সে মুসলমানদের ওপর সব রকমের যুলুম অত্যাচার চালাবে এবং এ সব দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলমানদের বরদাশত করতে হবে। কিন্তু এরপর আপনারা জেনে রাখুন, হিন্দুজাতের মধ্যে যে অভ্যন্ত রীণ স্ববিরোধিতা বর্তমান রয়েছে, শেষ পর্যন্ত তা বেরিয়ে পড়বে এবং এ সব স্ববিরোধিতার কারণে এ জাতীয়তাবাদ আপনা আপনি মৃত্যুবরণ করবে। সে সময় পর্যন্ত আপনাদের ধৈর্য ধারণ করতেই হবে। এ সময়ের মধ্যে আপনাদের উচিত ভারতের সমস্ত বড় বড় ভাষায় যথা হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু মালয়ালম, বাংলা প্রভৃতিতে যথাসম্ভব বেশী করে ইসলামী বই পুস্তক প্রকাশ করা। এ দেশের বড় বড় ভাষায় যদি আপনারা ইসলামী পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধর যেমন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে তেমনি হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটবে।

১৯৪৭ সালের মে মাসে পাঠানকোটের নিকটবর্তী দারুল ইসলাম গ্রামেও আমরা একটি জনসভা অনুষ্ঠিত করি এবং হিন্দু শিখ ও মুসলমান সবাইকে এতে যোগদান করার দাওয়াত জানাই। এ সময় পূর্ব পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ দাংগা চলছিল, তা সকলেরই জানা। এহেন পরিস্থিতিতে এ তিন জাতি একই সভায় মিলিত হবে, এ কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু খোদার রহমতে আমরা তাদেরকে সমবেত করেছি এবং এ সভায় আমি যে ভাষণ দেই তা 'ভাংগা গড়া' নামে একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আজও যে কোনো ব্যক্তি সে ভাষণ পড়লে বুঝতে পারবেন যে আমি সে সাংঘাতিক পরিস্থিতিতেও উক্ত জনসমাবেশে কিভাবে সত্য কথা বিবৃত করেছি।

দেশ বিভাগের পর জামায়াতের কর্মসূচী

১৯৪৭ সালের মে মাসে দারুল ইসলামে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ও মুত্তাফিকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমি দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে কিভাবে কাজ করতে হবে তা সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছিলাম। আমার এ বক্তৃতা 'জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এটি পড়ে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দেশ বিভাগের আগেই জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের কিরূপ স্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের আগস্টের শেষের দিকে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র দারুল ইসলাম থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত হয়।[১]

এ সময় জামায়াতের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৬২৫ জন। তন্মধ্যে ২৪০ জন ভারত ও অধিকৃত কাশ্মীরে রয়ে গেছেন আর পাকিস্তানে যে সব সদস্য আগে থেকে ছিলেন এবং যারা হিজরত করে এলেন তাদের নিয়ে মোট ৩৮৫ জন হলো। এভাবে পাকিস্তানে ৩৮৫ জন সদস্য নিয়ে জামায়াতের কাজ শুরু হয়। আমরা প্রথম দিনই ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী ও পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন আলাদা করে ফেলি। কেননা এ দুটোর মধ্যে যোগাযোগের কোনো

(১) আজকাল অনেকে আমাকে পরিহাসচ্ছলে বলেন যে, তুমি পালিয়ে পাকিস্তানে এলে কেন? আমি অবশ্য বুঝি যে, পাকিস্তানে আমার অবস্থান তাদের জন্য কি সাংঘাতিক মর্মপীড়ার কারণ আর এ মর্মপীড়ায় আমি তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। তবে তারা হয়তো জানেন না যে, আমি তখন পূর্ব পাঞ্জাবে ছিলাম এবং সে এলাকা থেকে জোরপূর্বক মুসলমানদের উৎখাত করার কারণে আমার পক্ষে পাকিস্তানে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। এরূপ না হলে আমি অবশ্যই ভারতীয় জামায়াতে ইসলামীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতাম। তবুও পাকিস্তানের জামায়াত কর্মীরা তো আর চুপ করে বসে থাকত না। তারা আজকাল যে দায়িত্ব পালন করছেন তা আমি না এলেও করতেন এবং যে কাজের দরুন এ ভদ্রলোকেরা মর্মপীড়ায় ভুগছেন, তা না হয়ে যেত না।

সম্ভাবনা ছিল না (পরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, অধিকৃত কাশ্মীরের সংগঠনও ভারতীয় জামায়াত থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে)।

দেশ বিভাগের পর মাত্র কয়েক মাস অতিবাহিত না হতেই দেখা গেল, দেশবিভাগের আগে আমরা যে সব আশংকা প্রকাশ করেছিলাম তা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।

যে ধরনের পরস্পর বিরোধী চরিত্রের অধিকারী লোকেরা একত্র হয়ে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তা দেখে আমরা পাকিস্তান হবার পরবর্তী অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। বাস্তবেও দেখা গেল তাই হচ্ছে। আজ ২৩ বছর পর আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, দেশ বিভাগের কয়েক বছর আগে আমরা যা বলেছিলাম তার প্রত্যেকটি এক এক করে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এখন কারুর সাধ্য নেই আমাদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

দেশ বিভাগের পর আমরা পাকিস্তানে এসে সর্বপ্রথম মুহাজিরদের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে, তখন আজ যারা নিজেদেরকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবী করেন তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিন্দুদের পরিত্যক্ত জায়গা জমি দখলের চেষ্টায় ছিল আর তাদের মধ্যে কতেক মুহাজিরদের ক্যাম্পে তাদের সেসব সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল যারা হিন্দু ও শিখদের হাত থেকে কোনোক্রমে বেঁচে এসেছিল। এ সময়ে মুহাজিরদের মধ্যে রেশন বন্টন করার জন্য খোদ সরকারী অফিসারদেরও জামায়াত কর্মীদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল যে, তাদের মাধ্যমেই রেশন মুহাজিরদের কাছে ঠিক ঠিক মত পৌছাবে (দেশ বিভাগের পর থেকেই যে এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে শুরু করেছিল, তার চাক্ষুস সাক্ষী এখনো রয়েছে)। এরপর আমরা স্পষ্টত অনুভব করলাম যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের এখন আর পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার ইচ্ছে নেই। [১]

১। কিছু সংখ্যক লোক আমার এ কথাটির নানারকম ভিত্তিহীন অর্থ গ্রহণ করে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। কেউ বলেছেন, আমি নাকি বলতে চাই যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রথম থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছে ছিল না। অধিকন্তু আরো দুষ্টুমী করে এর মধ্যে এ অর্থ ঢুকাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমি আসলে নাকি কায়েদে আযমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছি। অথচ এ দুটোই ভুল। কায়েদে আযম সম্পর্কে আমার ধারণা আমি মুনীর তদন্ত আদালতের সামনে প্রদত্ত আমার দ্বিতীয় বিবৃতিতে (৮ই নভেম্বর ১৯৫৩) উল্লেখ করেছি এবং তিনি যে একটি খালেছ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছিলেন তা অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করেছি। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা বলতে আমি যে সব সুবিধাভোগী লোককে বুঝিয়েছি যারা পাকিস্তান আন্দোলন জনপ্রিয় হচ্ছে দেখে তাতে শুধু যোগদানই করেননি বরং আগের কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য তাদের সম্পর্কেও আমি এরূপ বলিনি যে, প্রথম থেকে তাদের ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার ইচ্ছে ছিল না। বরং পাকিস্তান কায়েম হবার পরেই তাদের কার্যকলাপ দ্বারা বুঝা গিয়েছিল যে, তাদের সে ইচ্ছে আর বহাল নেই। নতুবা আদর্শ প্রস্তাব পাশ হতে দেড় দু'বছর লেগে যাওয়ার কারণ কি? তা প্রথমেই পাশ করা যেত। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের বিপক্ষে যে সব খোড়া যুক্তি দেয়া হচ্ছিল তাই বা কেন দেয়া হলো?

আমি জিজ্ঞেস করি এবং প্রত্যেকেরই চিন্তা করে দেখা উচিত যে, বাস্তবিকই যদি পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র রূপে গড়ে তোলা তাদের ইচ্ছে থাকতো তাহলে প্রথম সুযোগেই গণপরিষদে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করা কি উচিত ছিল না? যে প্রস্তাবকে দেড় দু'বছরের চেষ্টার পর পাশ করা হলো তা তো প্রথম দিনেই পাশ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি বড় বড় নেতারা তাদের বক্তৃতায় বলছিলেন যে, এখানে যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় তাহলে শতকরা ৯৫ জন লোকের হাত কাটা যাবে অর্থাৎ কিনা তাদের মতে পাকিস্তানের শতকরা ৯৫ জনই চোর! এমন কি এরূপ কথাও বলা হয়েছিল যে, এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে আমরা দুনিয়ার সামনে মুখ দেখাব কি করে? এরূপ লজ্জাকর যুক্তিও দেয়া হলো যে, পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাবে। এরূপ আরো কত বাহানা যে সে সময় তোলা হয়েছিল তার কোনো ইয়ত্তা নেই।[২]

ইসলামী রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি

এ পরিস্থিতি যখন দেখা দিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী উপেক্ষা করার প্রয়াস চললো তখন আমি ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর ল' কলেজে এক বক্তৃতা দেই। এতে আমি ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন কানুন সম্পর্কে সব ভুল ধারণা অপনোদন করি। আমি স্বীয় বক্তৃতায় প্রথমে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করি এবং তার পরে চারটা মূলনীতি বর্ণনা করি যা স্বীকার না করলে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না। ১) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হবে। ২) সরকারকে অংগীকারে আবদ্ধ হতে হবে যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থেকে কাজ করবে। ৩) বৃটিশ শাসনামলের উত্তরাধিকার ইসলাম বিরোধী আইনগুলো সংশোধন করতে হবে। ৪) ভবিষ্যতের যাবতীয় আইন কানুন ইসলাম অনুযায়ী রচিত হবে।[১] আমি প্রস্তাব পেশ করি যে আমাদের গণপরিষদের কর্তব্য প্রথমে আইনের ভাষায় এ মূলনীতিগুলো মঞ্জুর করা। এর পরেই এ সরকার ইসলামী সরকার বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবেনা। যেমন কোনো ব্যক্তি কালেমায়ে তাইয়েবা মুখে উচ্চারণ না করে মুসলমান হতে পারে না, তেমনি কোনো রাষ্ট্র সে পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না

২। এসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব আমি এপ্রিল ও মে ১৯৪৮ সালে লাহোর, মুলতান, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট ও পেশোয়ারে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহে দিয়েছিলাম। এসব বক্তৃতা পুস্তিকাকারে 'মুতালাবায়ে নিজামে ইসলামী' নামে তখনই প্রকাশিত হয়েছিল। এখন সেটি আমার গ্রন্থ 'ইসলামী রিয়াসতে' শামিল করা হয়েছে।

১। ইসলামী কানুন' নামে একটি পুস্তিকার আকারে এ ভাষণ প্রকাশিত হয়েছে।

যে পর্যন্ত সে স্বীকার না করে যে তার বাদশাহ্ হচ্ছেন আল্লাহ। যতক্ষণ সে স্বীকার না করবে যে দুনিয়াতে যারা এ সরকার পরিচালনা করে তারা আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবেই তা করে, যতক্ষণ সে স্বীকার না করবে যে তার আইন কানুনের উৎস কোরআন ও সুন্নাহ্, যে পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত না করবে যে তার চতুসীমার মধ্যে অনৈসলামী আইন জারী হতে পারবে না, ততক্ষণ তা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে না।

একটি জঘন্য মিথ্যা ও নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারী

এ দাবি উত্থাপন করার পর যখন আমরা তার পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা শুরু করলাম, অমনি ক্ষমতাসীনরা কি করে আমাদের মুখ বন্ধ করা যায় সে চেষ্টায় মেতে উঠলেন। প্রকাশ্যে তো আর 'ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে রাজী নয়' এমন কথা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। এ জন্য যাতে আমাকে আমার সঙ্গী সাথীদেরকে অন্য কোনো অভিযোগের ফাঁদে আটকানো যায় সে জন্য একটি ষড়যন্ত্র তৈরী হলো। ষড়যন্ত্রটা হচ্ছে, ১৯৪৮ সালের মে মাসে পেশোয়ার থেকে জনৈক ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। ইনি আজাদ কাশ্মীরের পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন। তিনি আমার সাথে গোপন আলাপ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলে আমি তাকে নির্জন কক্ষে ডেকে আনলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাশ্মীরের জেহাদে অংশ গ্রহণ করছেন না কেন?

আমি বললাম এর একটি কারণ রয়েছে যা আমি ব্যক্ত করতে চাই না।

তিনি বললেন, 'অন্ততপক্ষে আমাকে তো বলুন। আমি শুধু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।' আমি বললাম, যে জাতির সাথে পাকিস্তানের সরকার যুদ্ধ করে না, তার সাথে পাকিস্তানের নাগরিকরা কি করে যুদ্ধ করতে পারে? আমি এটা বুঝতে পারি না। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নীরবই থাকতে চাই, আমার মতামত ব্যক্ত করতে চাই না। পরের দিনই তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি জারী করে দেন যে, মাওলানা মওদূদী কাশ্মীরের জেহাদকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং একথাও বলেছেন যে, এ যুদ্ধে যারা নিহত হচ্ছে তাদের হারাম মৃত্যু। এর পর এ মিথ্যাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো। শ্রীনগর রেডিও তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলো এবং কাশ্মীরে যুদ্ধরত মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে প্রচার করতে লাগলো যে, পাকিস্তানের অমুক আলেম বলেছেন যে তোমরা যুদ্ধ করে মরলে তোমাদের হারাম মৃত্যু হবে।

আমি রেডিও পাকিস্তানকে লিখলাম যে, অধিকৃত কাশ্মীর রেডিও আমার নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে। আমাকে এর প্রতিবাদ করার এবং এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা, তা জনগণের সামনে বলার অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু আমাকে অনুমতি দিতে সরাসরি অস্বীকার করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসনের দাবী নস্যাৎ করা আমাদের ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিতে কাশ্মীর সমস্যার চেয়েও জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার নাম নিয়ে কাশ্মীরের মুজাহিদদের উৎসাহ ভংগ করা হচ্ছিল। অথচ তাদের সে ব্যাপারে পরোয়াই ছিল না। তাদের কেবল চিন্তা ছিল ইসলামী শাসনের আন্দোলনকে কিভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। আজ পর্যন্ত সে মিথ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। যখনি আমি পাকিস্তানের সংস্কারের জন্য কোনো চেষ্টা চালাই অমনি এ মিথ্যার ফানুস ওড়ানো শুরু হয়। অথচ আমি একাধিকবার এর প্রতিবাদ করেছি। এ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার পর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে এবং মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী ও মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদকে গ্রেফতার করা হয়। একাধিক্রমে ২০ মাস আমাদেরকে আটক করে রাখা হয়। তারা মনে করেছিল যে, এ তিনজন মানুষকে আটক করলেই জামায়াতে ইসলামী খতম হয়ে যাবে। কিন্তু জামায়াত যে তাসের ঘর নয় বরং গবেষণার পর তৈরী করা একটি মজবুত সংগঠন, একথা তারা ভুলে গিয়েছিল। আমাদের গ্রেফতারীর পরেও ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করা হয়। অথচ এটি আমাদের গণপরিষদে প্রথম দিনেই পাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ প্রস্তাব পাশের আগে বা পরে এমন কোনো নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়নি, যাতে করে বুঝা যেতে পারে যে এখন বাস্তবিকই আমাদের দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রকৃত স্বরূপ আমি মুক্তি লাভের পর এক বক্তৃতায় এরূপভাবে ব্যক্ত করেছিলাম যে, 'এ একটি আজব বৃষ্টিপাত। এর আগে কোনো মেঘ করেনি, পরেও মাটিতে কোনো জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়নি। শুধু একটি প্রস্তাবই পাশ করা হয়েছে মাত্র।'

প্রশ্ন হলো, সরকার যদি সত্যি সত্যি আমাদের দাবী মনেপ্রাণে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তার পরেও আমাদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত আটক রাখার কি বৈধতা থাকতে পারে? এরপরেও তো সরকারের বলা উচিত ছিল যে, এখন জামায়াত ও মুসলিম

লীগের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আসুন, এবার আমরা সম্মিলিত উদ্দেশ্যের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। [১]

কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গেল যে, ঐ প্রস্তাব শুধুমাত্র আমাদের জব্দ করার জন্য পাশ করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়নের জন্য নয়। এর পরেও আমাদের আটকাদেশ প্রত্যেক ছয় মাস পরপর সম্প্রসারিত করা হতে থাকে। এ সময় অন্য একটি আদালত কোনো মামলার রায় দেয় যে, একজন মানুষের আটকাদেশ তিন বারের বেশি মেয়াদ বৃদ্ধি করা চলে না। এ রায়ের ফলে নেহায়েৎ ঘটনাক্রমে আমরা মুক্তি পেয়ে গেলাম। নচেৎ আদর্শ প্রস্তাব পাশকারীদের এরূপ ইচ্ছে ছিল না যে সারাজীবনেও কোনোদিন আমাদের জেল থেকে বের হতে দেবে।

খতমে নবুয়্যতের আন্দোলন ইসলামী শাসনতন্ত্র বানচালের ষড়যন্ত্র

জেল থেকে মুক্তি লাভের পর আমরা পুনরায় দাবি তুলি যে, এখন আদর্শ প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। খাজা নাজিমুদ্দীন মরহুমের আমলে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরুও হয়েছিল। কিন্তু তার গতিরোধ করার জন্য আবার এক চক্রান্ত করা হয় এবং ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর ওপর তৃতীয় হামলা চালানো হয়। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবি ধামাচাপা দেয়ার জন্য খতমে নবুয়্যতের আন্দোলন পাকিয়ে তোলা হয়েছিল। (মুনীর রিপোর্ট থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি এ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আমার গ্রন্থ 'কাদিয়ানী সমস্যায়' বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছি) এ সময় খতমে নবুয়্যত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে বহু বুঝানো হয় যে আল্লাহর ওয়াস্তে একবার শাসনতন্ত্রটা পাশ হতে দিন এবং এরপরে আপনারা এ সমস্যা তুলবেন। খাজা

১। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে আমি দেশের বিভিন্ন স্থানের জনসভায় যে সব বক্তৃতা করি তাতে আমি একথাই বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, "আমি আমার মুসলিম লীগ ভাইদের বলতে চাই, আপনারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার কথা বলে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। আপনারা সব কিছু ইসলামের নামেই করেছিলেন। এখন আপনাদের পরীক্ষা সমাগত। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে এ দাবিকে নিজেদের দাবিতে পরিণত করুন। একে মুসলিম লীগের আঞ্চলিক সংগঠনগুলো দ্বারা পাশ করিয়ে নিন। অতপর প্রাদেশিক লীগে এটি তুলুন। যারা এ দাবিতে একমত হবেনা তাদেরকে বের করে দিন। এখন কম্যুনিষ্ট, নাস্তিক ধরনের লোকদের মুসলিম লীগের ওপর কর্তৃত্ব ফলাবার কোনো অধিকার নেই। যদি এ দুটো কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় (দাবি মেনে নেয়া ও ইসলাম বিরোধী লোকদের বের করে দেয়া) তাহলে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীতে কোনো পার্থক্য থাকে না। উভয়টি প্রায় এক হয়ে যায়।" আমার গ্রন্থ 'ইসলামী রিয়াসাত' দেখুন সংস্করণ ১৯৬২, পৃঃ ৩৮৭।

নাজিমুদ্দীনের রিপোর্ট তৈরী হয়ে গিয়েছিল। শাসনতন্ত্র পাশ হতে আর বেশী বিলম্ব ছিল না। শুধুমাত্র গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশ হতে এবং শাসনতন্ত্র মঞ্জুর হতে যা দেরী ছিল। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে দাংগা হাংগামা শুরু হয়ে গেল। খাজা নাজিমুদ্দীন রিপোর্ট যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। লাহোরে সামরিক আইন জারী হলো। খাজা নাজিমুদ্দীনের ওজারতি গেল আর সে সাথে আমলাতন্ত্রের রাজত্ব এমন মজবুত ভাবে শিকড় গেড়ে বসলো যে, আজো পর্যন্ত তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়নি।

১৯৪৯ সাল থেকে একটি সরকারী অথবা আধা সরকারী 'প্রচার সেল' জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা অভিযান চালিয়ে আসছে। এটি ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রীতিমত বেতনভুক্ত অথবা মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত লোকেরা জামায়াতের বিরুদ্ধে নানা রকমের অপবাদ রটনা এবং ইসলাম সম্পর্কে লোকদের মনে যতদূর সম্ভব সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকে। সরকারী তহবিল থেকে এ জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়। বহু পত্র পত্রিকা এই কাজ করতে থাকে, বহু বই পুস্তক আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয় এবং সরকারীভাবে প্রত্যেক মহলে তা বিলি করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর দুর্নাম রটানোর জন্য কোনো সুযোগ বাকী রাখা হয়নি। আর সে সাথে প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে জনগণের মনে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, যেন লোকে অনন্যোপায় হয়ে ভাবতে শুরু করে যে ইসলামের নিকট কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও নেই আর বর্তমান যুগে কার্যোপযোগী কোনো আইনও নেই।

১৯৫৫ সাল থেকে আলেমদের একটা গোষ্ঠিও আমাকে ও জামায়াতে ইসলামীকে গালিগালাজ করা ও আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনায় লেগে রয়েছে। আমি জেলে থাকা অবস্থায়ই এ কাজ শুরু করা হয়। আর আজ ১৫ বছর হয়ে যাচ্ছে গালাগালি এ অভিযান ক্রমশ জোরদার ও তীব্রতর হয়ে চলেছে।

স্বৈরাচারী আইয়ুবের কবলে জামায়াতে ইসলামী

এরপরে আসে ১৯৬৩ সালের ষড়যন্ত্রের কথা। তখন জামায়াতকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য মারাত্মক চেষ্টা চালানো হয়। এ লাহোর শহরে আমরা জামায়াতের সম্মেলন করছিলাম। প্রথমে লাউড স্পীকারের অনুমতি দেয়া হল না, তারপরে তার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান দেয়া হল এবং সেখানে সুসজ্জিত গুণ্ডা বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এই গুণ্ডাবাহিনী কে প্রেরণ করেছিল? তা আজ আর

কারো অজানা নেই। পরিকল্পনা ছিল গুণ্ডারা এসে হট্টগোল বাঁধাবে আর জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা যদি কোনো গুণ্ডার ওপর হাত তোলে তাহলে তৎক্ষণাৎ পুলিশ ব্যাপক হামলা চালাবে এবং জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গুলি বর্ষণ শুরু করবে। যারা এ পরিকল্পনা তৈরী করেছিল তারা পরিষ্কার বলেছিল যে, মিশরে ইখওয়ানের যে দশা হয়েছে আমরা এখানে জামায়াতের সে দশা করবো। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে জামায়াত নিজকে এতটা সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করে নিয়েছিল যে শত্রুদের এই সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। জামায়াতের একজন কর্মীও কোনো দুষ্কৃতিকারীর ওপর হাত তোলেনি। দুষ্কৃতিকারীরা একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লাফালাফি করে বেড়ালো। শামিয়ানার দড়ি কেটে দিল। সমগ্র সভাস্থলে তারা হৈ চৈ করে বেড়াল। কিন্তু তারা যখন দেখলো যে এখানে তাদেরকে কেউ কিছু বলেইনা, তখন অগত্যা মুখ পাংশু করে চলে গেল। জামায়াতের জনসভা পূর্ণশান্তি শৃংখলার সাথে অব্যাহত থাকলো। তারা ভেবেছিল যে সম্মেলনে যখন আমার দিকে পিস্তল দিয়ে গুলি চালানো হবে তখন আমি কোনো চৌকির নীচে গিয়ে পালাবো। কিন্তু তারা যখন দেখলো যে মানুষটা একদম দাঁড়িয়ে রয়েছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকলো এবং এক মুহূর্তের জন্যও বসলোনা তখন তারা হতোদ্যম হয়ে পড়লো এবং বুঝতে পারলো যে, যেমন তেমন লোকের পাল্লায় তারা পড়েনি।

(সম্মেলনের প্যান্ডেলের পেছনে এক হাজারেরও বেশী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। দুষ্কৃতিকারীরা তাদের শিবিরেও বোতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। অথচ তাদের মধ্যে কোনো বিব্রতবোধ পরিদৃষ্ট হয়নি। এ হাংগামার মধ্যে আমাদের জনৈক কর্মী আল্লাহ বখশকে শহীদ করে দেয়া হয়। তার স্ত্রী ও মেয়ে মহিলাদের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তারা যখন আপন পিতা ও স্বামীর শাহাদাতের খবর জানতে পারেন তখন তারা কোনো আহাজারী পর্যন্ত করেননি। বরং পূর্ণ ধৈর্যের সাথে বিছানা পত্র বেঁধে শহীদের লাশ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি সে সময় আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, আমরা দুনিয়ার কোনো আদালতে এ খুনের বিচার চাইব না। এ খুনের মামলা অন্য এক জায়গায় দায়ের হয়ে গেছে এবং এর ফায়সালা ইনশাআল্লাহ সেখান থেকেই হবে। শেষ পর্যন্ত সেই অদৃশ্য আদালত থেকে মামলার এমন আদর্শ বিচার হলো যে খুব কম যালেমই তার যুলুমের এমন সাংঘাতিক পরিণতি দেখেছে।)

জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা

এ চক্রান্ত যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো তখন অবশেষে ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামীকে হঠাৎ বেআইনী ঘোষণা করা হলো। জামায়াতে ইসলামী ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের দাবিতে সমগ্র দেশব্যাপী একটি দুর্বার স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করে। এ অভিযানের ফলে মৌলিক অধিকারের দাবি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আইনের খসড়া বিল পরিষদে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইচ্ছাপূর্বক তাতে স্বাক্ষর দিতে বিলম্ব করেন। ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী জামায়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ও আমাদেরকে গ্রেফতার করার কাজ সম্পূর্ণ হলে তারপর ১০ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট উক্ত বিলে স্বাক্ষর দান করেন। উদ্দেশ্য ছিল শুধু মৌলিক অধিকার আইনের সুফল থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তার এ পদক্ষেপও জামায়াতকে খতম করতে সক্ষম হয়নি। হাইকোর্ট আমাদের গ্রেফতারী এবং সুপ্রিম কোর্ট জামায়াতের নিষিদ্ধকরণের নির্দেশকে বাতিল ঘোষণা করে। যখন আদালত এ রায় ঘোষণা করে তারপর ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত না হতেই জামায়াতে ইসলামী সে জায়গায় এসে দাঁড়ালো যেখানে আইয়ুব খানের হামলার আগে দাঁড়িয়ে ছিল। ১৯৫৮ সালের সামরিক আইনে অন্যান্য দলের সাথে জামায়াতও ৪৫ মাস নিষিদ্ধ থাকলো, তখনও এরূপ হয়েছিল। আমি তখনও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলাম যে, আপনারা এসব চক্রান্ত দ্বারা জামায়াতকে খতম করতে পারবেন না। যখনই সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে, জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন তখনই মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুনরায় বহাল হবে।

যে ইতিহাস আমি বর্ণনা করলাম, তা থেকে আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে দেশ বিভাগের আগেই জামায়াতের সংগঠনকে যদি ৬ বছর ধরে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো না হতো, তাহলে পরবর্তী যুগে একে ধ্বংস করার জন্য অবিশ্রান্তভাবে যে সব চেষ্টা তদবীর করা হয়েছে, তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে জামায়াত বহু আগেই খতম হয়ে যেত। গত ২৩ বছরের ক্ষমতাসীন সরকারসমূহ আমলাতন্ত্র, জায়গীরদার ও পুঁজিপতি, ধর্মহীনতা ও সমাজতন্ত্রের ধারক বাহক দলগুলো, বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্তির প্রসারকারী লোকেরা, নানা ধরনের বিরোধী রাজনৈতিক এবং আলেমদের বিভিন্ন গোষ্ঠি এ দলকে খতম করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এমনকি এমন এক সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সমস্ত সংবাদপত্র জগত জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রচারণা

চালিয়েছে এবং কোনো একটিও জামায়াতের পক্ষ সমর্থন করেনি। তা সত্ত্বেও জামায়াত শুধু বেঁচেই থাকেনি এবং তার কদম সামনে এগিয়ে চলেছে এবং কোনো শক্তি তার গতি স্তব্ধ করতে পারেনি। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের ফল। যার জন্য শোকর আদায় করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

জাতীয় কল্যাণে জামায়াতের অবদান

এবার জামায়াত গত ২৯ বছরে জাতির কল্যাণের জন্য কি কি কাজ করেছে আমি তার একটা বিবরণ পেশ করতে চাই।

জামায়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হলো, সে এক বিশাল ও ব্যাপক সাহিত্য জগত সৃষ্টি করেছে। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাজার হাজার বই পুস্তক প্রকাশ করেছে। জামায়াতের এসব বই পুস্তক ইসলামের সভ্যতা ন্যায়ানুগত্য ও তার কার্যোপযোগিতা সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা তাদের মন মগজে যে সব সন্দেহ, সংশয় ও বিভ্রান্তির জাল বুনেছে তার সবই অতি সুন্দরভাবে অপনোদন করতে সক্ষম। জামায়াতে ইসলামী শুধু বক্তৃতার খই ফুটিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন নয়। বক্তৃতা তো বাতাসে উড়ে যায়। জামায়াতে ইসলামী এক মজবুত সাহিত্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যে সাহিত্য ইনশাআল্লাহ এ দেশে বহু শতাব্দি পর্যন্ত কায়েম থাকবে। গত ২৯ বছরে এ সাহিত্য লাখ লাখ পরিবারে গিয়ে পৌঁছেছে, লাখ লাখ মানুষ তা পড়েছে এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও পড়বে। এ সাহিত্য যেখানেই গেছে, সেখানে মানুষের মন মগজের মধ্যে এত গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করেছে যে, খোদার অনুগ্রহে এখন আর কারোর সাধ্য নেই তা কারোর মনমগজের মধ্য থেকে টেনে বের করে। শিক্ষিত জনগণের একটি বিরাট অংশ এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি আধুনিকতম রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্পূর্ণ সম্ভব। অধিকন্তু এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব যে, দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্র এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এখন যদি কেউ এমন কথা বলার দুঃসাহস দেখায় যে ইসলাম একটা প্রাচীন ব্যবস্থা যা বর্তমান যুগে চলার যোগ্য নয়, তাহলে হাজার হাজার মুখ তাকে দাতভাংগা জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত আছে, এটা জামায়াতে ইসলামীর একটি অসাধারণ কীর্তি, যা সে আল্লাহর অনুগ্রহে আঞ্জাম দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী সংগঠনে জামায়াত

জামায়াত নিষ্ঠাবান ও নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী কর্মীদের একটি সুসংগঠিত বাহিনীও তৈরী করেছে। এটা তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। এ কর্মীবাহিনী অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা লাখ লাখ মানুষকে জামায়াতের সমর্থক বানিয়েছে। দেশের মধ্যে নিজের সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রচুর সুনাম ও আস্থা অর্জন করেছে। এ কর্মীবাহিনী যখনই স্বদেশে অথবা বিদেশে মুসলমানদের ওপর কোনো বিপদ মুসিবত আপতিত হয়েছে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের সম্ভাব্য সব রকমের সেবা ও সাহায্য করেছে আর দেশের প্রত্যেক অংশ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন স্থানীয় নেতৃত্ব সরবরাহ করেছে। দেশের জনগণের নিকট জামায়াত ও তার কর্মীদের কতখানি সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে তা পরীক্ষার মুহূর্তেই প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ বকরা ঈদে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা জনসেবার জন্য চামড়া সংগ্রহ করে থাকে। প্রত্যেক বছর বকরী ঈদ সমাগত হওয়া মাত্রই (মহল বিশেষ কর্তৃক) পোষ্টার দিয়ে প্রাচীরগাত্র ছেয়ে ফেলা হয়। এ সব পোষ্টারে লেখা হয় যে জামায়াতে ইসলামীকে চামড়া দেয়া হারাম। সব রকমের অপবাদ জামায়াতের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়। লোকেরা যাতে তাকে চামড়া না দেয়, সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না। কিন্তু তারা সবাই মিলে যত চামড়া সংগ্রহ করে তার চাইতে অনেক বেশী চামড়া শুধু জামায়াতকে দেয়া হয়। জামায়াতের বিরোধীরা পর্যন্ত নিজেদের কোরবানীর চামড়া জামায়াতের হাতে অর্পণ করেছে। আইয়ুব খান সাহেবের চরম স্বৈরাচারী শাসনামলেও যখন জামায়াতের সংস্পর্শে যাওয়াও বিপদের কারণ ছিল, বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ সরকারী অফিসার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোরবানীর চামড়া জামায়াতে ইসলামীকে পাঠিয়ে দিতেন।

এর কারণ হচ্ছে, জাতির মধ্যে সাধারণভাবে একটি আস্থা জন্মে গেছে যে এ দলের কর্মীদেরকে যা কিছু দেয়া হবে তা উপযুক্ত ব্যয়ের খাতেই ব্যয়িত হবে। এরা এক কাজের নামে চাঁদা বাগিয়ে অন্য কাজে ব্যয় করার লোক নয়। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধেও জামায়াত জনগণের নিকট কত জনপ্রিয় ও আস্থাভাজন, তা সপ্রমাণ হয়েছে। সে সময় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে যত চাঁদা যুদ্ধ উপদ্রুত লোকদের সাহায্যের জন্য সংগ্রহ করেছে তার চাইতে কয়েকগুণ বেশী চাঁদা জামায়াত একাই সংগ্রহ করেছে। যুদ্ধের সময়

বহুবার এমন হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা বহু মূল্যবান সামগ্রী যুদ্ধ উপদ্রুতদের সাহায্যার্থে নিয়ে এসেছে এবং জামায়াত কর্মীদের বলেছে যে এগুলো যদি আপনারা স্বয়ং বন্টন করেন তাহলে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দেই। আর যদি অন্য কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানকে দিতে চান তাহলে ফেরত নিয়ে যাই। এ ধরনের বহু পরীক্ষা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে যা দ্বারা দেশে জামায়াত কর্মীদের কত সুনাম, তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

(এ ছাড়া গত ২৩ বছরে ঝড় ও বন্যা উপদ্রুতদের জন্য, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ উপদ্রুতদের জন্য, কাশ্মীর জেহাদ তহবিল, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা তহবিল, ফিলিস্তিন জেহাদ তহবিল এবং ইরিত্রিয়ার মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য পাকিস্তানের জনগণ নগদ টাকা ও দ্রব্য সামগ্রীর আকারে সর্বমোট ৭৮ লক্ষ টাকা জামায়াতকে দিয়েছে এবং তার পূর্ণ হিসাব জামায়াতের কাছে রয়েছে। সম্ভবত দেশের অন্য কোনো দলের প্রতি জাতি এত বেশী আস্থা স্থাপন করেনি।)

গালিগালাজের ঝড় যথারীতি বয়ে চলেছে। মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসার ধারাও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু যখনই আমরা জনগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়েছি, তখন বুঝতে পেরেছি যে তারা জামায়াতের উপর যতখানি বিশ্বাস ও আস্থা রাখে ততখানি আর কারোর ওপর রাখে না।

ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় জামায়াত

যেসব দল ও প্রতিষ্ঠান এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় অথবা যেসব আন্দোলন দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করতে ইচ্ছুক, জামায়াতে ইসলামী প্রত্যেক ময়দানে তাঁদের মোকাবেলা করেছে এটা জামায়াতের তৃতীয় বৃহৎ কীর্তি। এ সব আন্দোলন আসলে দেশের স্নায়ু কেন্দ্র দখল করে এবং তারপরে দেশের নাগরিক জীবনকে পংগু করে দিয়ে ঈপ্সিত বিপ্লব আনবার চেষ্টা করে। তারা ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক শিক্ষক ও অধ্যাপকদের করায়ত্ত করে ও তাদেরকে কাজে লাগায়। মোটকথা তারা এমন সব পথ অবলম্বন করে, যা করায়ত্ত করতে পারলে তাদের ঈপ্সিত বিপ্লবের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। জামায়াতে ইসলামী এ সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের মোকাবেলা করে যাবে। জাতির স্নায়ু কেন্দ্রগুলোতে এ সব ধ্বংসাত্মক শক্তির আগমন প্রতিরোধ করছে

এমন দল জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কোনোটা নয়। আপনাদের বিশ্বাস রাখা উচিত যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোক অথবা দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করার কোনো বিপ্লব হোক তা কখনো জনগণের সমর্থন নিয়ে আসবে না এবং তাকে শুধু জনসভা ও বক্তৃতা করে করে প্রতিরোধও করা যাবে না। এ স্নায়ুকেন্দ্রগুলোকে করায়ত্ত করেই এসব বিপ্লব এসে থাকে। শ্রমিকদেরকে করায়ত্ত করে দেশের অর্থনীতি, যোগাযোগ, রেলওয়ে, টেলিফোন ও তার ব্যবস্থা পংগু করে দিয়ে এ বিপ্লব আসে। ছাত্রদেরকে উস্কিয়ে দিয়ে মাঠে নামানো হয় এবং তাদের মস্তিষ্ক বিগড়ে দেয়া হয়। এবং তাদের মধ্যে বেহায়াপনা ও ধর্মবিরোধী ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা হয়। এভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে এ ধ্বংসাত্মক শক্তির মোকাবেলায় জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য কোনো দল যদি লিপ্ত থেকে থাকে তাহলে সে দলের নাম প্রকাশ করা উচিত। জামায়াতে ইসলামী জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত করেও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে আর সে সাথে ঐ সব স্নায়ুকেন্দ্রগুলোকেও তাদের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। এমনকি মাত্র এক বছরে সে এ সব ধ্বংসাত্মক শক্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

উপসংহার

এ হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী ও তার তৎপরতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ বিবরণ দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য কর্মী ও মুত্তাফিকরা যেন জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন ভালোভাবে উপলব্ধি করেন আর অন্যান্য যারা জামায়াত সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চান তাঁরাও যেন বুঝতে পারেন যে জামায়াতে ইসলামী জিনিসটা কি? আমি তাঁদের কাছে এ অনুরোধ করবোনা যে এসব জানা ও শোনার পর আপনারা জামায়াতের কদর করা শুরু করুন। জামায়াতের কাজের প্রকৃত মূল্য ও কদর আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ রয়েছে। আমি শুধু এটুকু কামনা করি, যে ব্যক্তি জামায়াতের আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন, তিনি যেন এর কাজকে সত্য সঠিক মনে করে নিশ্চিত মনে তা করেন। আর যাঁরা এর সাথে মিলিত হয়ে কাজ করা পসন্দ করেন না, তাঁরা যেন অন্তত কোনো প্রকার ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত না থাকেন। বস্তুত কেউ যদি আমাদের কাজের বিরোধিতা না করেন, তবে এটাও তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর একটি বিরাট অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে।

সমাপ্ত